এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গায্যালী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা ঃ ৫৫-বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন
(দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম গায্যালী (রহঃ)
অনুবাদ
মুহিউদ্দীন খান
প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫
প্রথম প্রকাশ
রমযান ১৪০৭ হিজরী
৬ষ্ঠ সংস্করণ
জমাদিউস সানী ১৪২৬ হিজরী
জুলাই ২০০৫ ইংরেজী
আষাঢ় ১৪১২ বাংলা
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ১৭০.০০ টাকা
ISBN : 984-8631-021-5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের আরজ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল্-গায্যালী রচিত 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীনঃ বিগত আট শতাধিক বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তাঁর এ অমরগ্রন্থ যেমন এক পথভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসিলম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গায্যালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য আমীর-ওমারাগণের মতই তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল বর্ণাঢ্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের ব্যাপক স্খলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতো। ইহুদী-নাসারাদের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন কোন সময় এ চিন্তা তাঁকে আত্মহারা করে ফেলতো। এ ভাবনা-চিন্তারই এক পর্যায়ে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে মৃতকল্প মুসলিম জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করে তোলা একমাত্র দ্বীনের স্বল্প আবে হায়াত পরিবেশনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর তা বিলাসপূর্ণ জীবনের অর্গলে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে পরিবার-পরিজন এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যাঁর সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আব্রু ঢেকে দিনের পর দিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জীবনে ইমাম সাহেব পবিত্র মক্কা, মদীনা, বাইতুল মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দামেশকের জামে মসজিদের মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন।

ইমাম সাহেবের এ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল এহইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা। এ গ্রন্থে ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ তাঁকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

এ মহাগ্রন্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পট-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আউয়ুবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান– যাঁদের নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গায্যালীর ভাবশিষ্য, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ভক্ত পাঠক।

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড অনুবাদের প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে চাই, এ মহাগ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই আমরা এ কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংস্করণে যথাসাধ্য সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশান্স থেকে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অষ্টম অধ্যায়

কোরআন তেলাওয়াতের আদব

প্রকাশ থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি নবী করীম (সাঃ) দ্বারা তাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং অবতীর্ণ কিতাব কোরআন দ্বারা তাদের উপর আনুগত্যের দায়িত্ব চাপিয়েছেন। কোরআন এমন এক ঐশীগ্রন্থ, যার মধ্যে অগ্র বা পশ্চাৎ থেকে মিথ্যা অনুপ্রবেশ করে না। চিন্তাশীলদের জন্যে এর কিস্‌সা-কাহিনী ও বর্ণনা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে বিধি-বিধানের বিশদ বর্ণনা এবং হালাল হারাম পৃথকীকরণের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে বিধায় এর মাধ্যমে সরল সঠিক পথে চলা সহজতর হয়ে গেছে। কোরআনই সত্যিকার আলো-নূর। এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ঈমান ও তওহীদে ব্যাধি দেখা দিলে তা থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। উদ্ধতদের মধ্যে যে এই কোরআনের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ তাআলা তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। যে এই গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করেছে, সে আল্লাহর নির্দেশ থেকে পথভ্রান্ত হয়েছে। হাবলে মতীন (সুদৃঢ় রশি), নূরে মুবীন (প্রোজ্জ্বল আলো) এবং ওরওয়া ওসকা (মজবুত বন্ধন)-এর বিশেষণ এবং স্বল্প-বিস্তর ও ছোট-বড় সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করা এর কাজ। এর বৈচিত্র্যাবলীর না আছে কোন শেষ এবং জ্ঞানীদের কাছে এর উপকারিতাসমূহের না আছে কোন চূড়ান্ত সীমা। তেলাওয়াতকারীদের কাছে অধিক তেলাওয়াতে একে পুরানো মনে হয় না; বরং প্রতিবারই নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থই পূর্ববর্তী সকল মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছে। জ্বিনরা এ কিতাব শ্রবণ করে দ্রুত তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে

এভাবে তাদেরকে অবহিত করে ঃ

فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ۔

অর্থাৎ তারা বলল ঃ আমরা এক অত্যাশ্চর্য কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সৎপথে পরিচালনা করে। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন থেকে আমরা আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

যে এ গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনে, সে-ই তওফীকপ্রাপ্ত এবং যে এতে বিশ্বাসী হয়, সে-ই সত্যায়নকারী; যে একে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, সে হেদায়াত পায় এবং যে এর নীতি পালন করে সে ভাগ্যবান ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۔

অর্থাৎ আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।

মানুষের অন্তরে ও সহীফাতে একে সংরক্ষিত রাখার উপায় হচ্ছে দৈনন্দিন তেলাওয়াত, এর আদব ও শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমল এবং শিষ্টাচার পালন করা। এ কারণেই এসব বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা জরুরী। নিম্নে চারটি শিরোনাম এসব দিয়ে বর্ণিত হবে।

কোরআন মজীদের ফযীলত

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করার পর মনে করে, কেউ হয়তো তার চেয়ে বেশী সওয়াব লাভ করেছে, সে ঐ বিষয়কে ক্ষুদ্র মনে করে, যা আল্লাহ্ বৃহৎ করেছেন।

০ কেয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী কোরআন অপেক্ষা বড় মর্তবার হবে না-না কোন নবী, না ফেরেশতা এবং না অন্য কোন ব্যক্তি।

০ যদি কোরআন চামড়ার মধ্যে থাকে, তবে তাতে আগুন লাগবে না।

০ আমার উম্মতের উত্তম এবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত।

০ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা সূরা তোয়াহা ও ইয়াসীন পাঠ করেন। ফেরেশতারা শুনে বলল ঃ এই কোরআন যাদের প্রতি অবতীর্ণ হবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। যে সকল অন্তর একে হেফ্য করবে তারা এবং যে সকল মুখে এটি পঠিত হবে তারা কত সুখী।

০ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কোরআন শেখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।

০ আল্লাহ বলেন ঃ কোরআন পাঠ যে ব্যক্তিকে আমার কাছে সওয়াল ও দোয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে শোকরকারীদের চেয়ে উত্তম সওয়াব দান করি।

কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি কাল মেশকের স্তূপের উপর অবস্থান করবে। তারা ভীত হবে না এবং তাদের কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে না যে পর্যন্ত না অন্য লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারাদি সম্পন্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন পাঠ করে, মানুষের ইমাম হয় এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

০ কোরআন তেলাওয়াত কর এবং মৃত্যুকে স্মরণ কর।

০ গায়িকা বাঁদীর গান তার মালিক যতটুকু শুনে, আল্লাহ্ কারীর কোরআন পাঠ তার চেয়ে অধিক শুনেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন পাঠ কর এবং ঝুলন্ত কোরআন যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে; অর্থাৎ কোরআন তোমার কাছে আছে এটাই যথেষ্ট মনে করো না। কারণ, যে অন্তর কোরআনের পাত্র, আল্লাহ্ তাকে আযাব দেন না।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা কর, তখন কোরআন অধ্যয়ন কর। কেননা, এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। এটাও তাঁরই উক্তি যে, তোমরা কোরআন পাঠ কর। তোমরা এর প্রত্যেকটি হরফের বদলে দশটি করে সওয়াব পাবে। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম এক হরফ; বরং আলিফ এক হরফ,লাম দ্বিতীয় হরফ এবং মীম তৃতীয় হরফ। তিনি আরও বলেন ঃ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজের কাছে দরখাস্ত করে তখন যেন কোরআনেরই দরখাস্ত করে। কারণ, কোরআনের সাথে মহব্বত রাখলে আল্লাহ ও রসূলের সাথে মহব্বত রাখবে। পক্ষান্তরে কোরআনের প্রতি শত্রুতা রাখলে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি শত্রুতা রাখবে।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত জান্নাতের এক একটি স্তর এবং তোমাদের গৃহের প্রদীপ। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, তার উভয় পার্শ্বে নবুওয়ত লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। পার্থক্য হল তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ যে গৃহে কোরআন পঠিত হয়, গৃহবাসীদের জন্য সেটি প্রশস্ত হয়ে যায়, তার কল্যাণ বেড়ে যায় এবং তাতে ফেরেশতা আগমন করে ও শয়তান বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কোরআন পাঠ করা হয় না, সেই গৃহবাসীদের জন্য সেটি সংকীর্ণ হয়ে যায়, তার কল্যাণ হ্রাস পায় এবং ফেরেশতা চলে যায় ও শয়তান এসে বাসা বেঁধে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম ঃ ইলাহী, যে সকল বিষয় দ্বারা তোমার নৈকট্য অর্জন করা হয়, সেগুলোর মধ্যে উত্তম কোন্ বিষয়টি? আল্লাহ বলেন ঃ হে আহমদ , সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে আমার কালাম দ্বারা নৈকট্য অর্জন করা। আমি বললামঃ ইলাহী, অর্থ বুঝে, না অর্থ বুঝা ছাড়াই? আদেশ হল ঃ উভয় প্রকারে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার কোরআন পাঠ শুনবে, তখন মনে হবে যেন তারা ইতিমধ্যে তেমনটি আর শুনেনি।

ফোযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরানের হাফেয তার এমন হওয়া উচিত যে, বাদশাহ থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কারও কাছে তার কোন প্রয়োজন নেই; বরং সকল মানুষ তারই মুখাপেক্ষী। তিনি আরও বলেনঃ কোরআনের হাফেয ইসলামের ধ্বজাধারী। তার উচিত ক্রীড়াকৌতুক ও বাজে বিষয়াদিতে মশগুল না হওয়া। এটাই কোরআনের তাযীমের দাবী।

সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন কোরআন পাঠ করে, তখন ফেরেশতা তার উভয় চোখের মাঝখানে চুম্বন করে। আমর ইবনে মায়মুন বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযান্তে কোরআন খুলে একশ আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর আমলের সমান সওয়াব দান করেন।

বর্ণিত আছে, খালেদ ইবনে ওকবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ আমার সামনে কোরআন পাঠ করুন। তিনি إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। খালেদ আরজ করলেন ঃ আবার পাঠ করুন। তিনি পুনরায় পাঠ করলেন। খালেদ বললেন ঃ এতে মিষ্টতা ও মাধুর্য আছে। এর নিম্নভাগ বৃষ্টির মত বর্ষণ করে এবং উপরিভাগ অনেক ফলবান। এটা মানুষের কথা নয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, কোরআনের চেয়ে বেশী মূল্যবান কোন সম্পদ নেই এবং এরপরে কোন অভাবও নেই। ফোযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা হাশরের শেষভাগ সকাল বেলায় পাঠ করে এবং সেদিন মারা যায়, তার জন্যে শহীদের মোহর অংকিত হবে। যে বিকাল বেলায় পাঠ করে এবং সে রাতে মারা যায়, তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে।

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি জনৈক আবেদকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এখানে তোমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী কেউ নেই? সে কোরআন মজীদের দিকে হাত বাড়িয়ে সেটি আপন কাঁধে রাখল এবং বলল ঃ এটি আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্লেষ্মা দূর হয়- মেসওয়াক করা, রোযা রাখা এবং কোরআন পাঠ করা।

গাফেলদের তেলাওয়াতের নিন্দা ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ অনেক মানুষ কোরান তেলাওয়াত করে, অথচ কোরআন তাদেরকে অভিসম্পাত করে।

মায়সারা বলেন ঃ পাপাচারী ব্যক্তির পেটে কোরআন মুসাফির ও অসহায়।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ কোরআনের হাফেয যখন কোরআন পাঠের পর আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করে, তখন দোযখের ফেরেশতা মূর্তিপূজারীদের তুলনায় এরূপ হাফেযকে দ্রুত পাকড়াও করে।

জনৈক আলেম বলেন ঃ যখন কেউ কোরান পাঠ করে, এর পর অন্য কথাবার্তা তাতে মিলিয়ে দেয় এবং পুনরায় কোরআন পাঠ করতে থাকে, তখন তাকে বলা হয়– আমার কালামের সাথে তোর কি সম্পর্ক?

ইবনে রিমাহ্ বলেন ঃ আমি কোরআন হেফয করে অনুতাপ করেছি। কেননা, আমি শুনেছি, কেয়ামতে কোরআন ওয়ালাদেরকে সেই প্রশ্ন করা হবে, যা পয়গম্বরগণকে করা হবে।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআনের হাফেযকে অনেকভাবে চেনা যায়– রাতে, যখন মানুষ নিদ্রিত থাকে, (২) দিনে, যখন মানুষ ত্রুটি করে, (৩) তার দুঃখে যখন মানুষ আনন্দিত হয়, (৪) তার কান্নার কারণে যখন মানুষ হাসে, (৫) তার চুপ থাকার কারণে যখন মানুষ এদিকে ওদিকের বাক্যালাপে মশগুল হয় এবং (৬) তার বিনয়ের কারণে যখন মানুষ অহংকার করে। হাফেযের উচিত অধিক চুপ থাকা এবং নম্র হওয়া- নির্দয়, কথায় বাধাদানকারী, হট্টগোলকারী ও কঠোর হওয়া উচিত নয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এই উম্মতের অধিকাংশ মোনাফেক কারী হবে। তিনি আরও বলেন ঃ যে পর্যন্ত কোরআন তোমাকে মন্দ কাজ করতে বারণ করে, সে পর্যন্ত কোরআন পাঠ কর। কোরআনের তেলাওয়াত মন্দ কাজে বাধা না দিলে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো না। অর্থাৎ এরূপ পড়া ও না-পড়া সমান। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি

কোরআনের হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করে, কোরআনের সাথে তার পরিচয় হয়নি। জনৈক মনীষী বলেন ঃ বান্দা এক সূরা তেলাওয়াত শুধু করে আর ফেরেশতা তার জন্যে রহমতের দোয়া করে। সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই দোয়া চলে। কতক বান্দা সূরা শুরু করে এবং ফেরেশতা সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অভিসম্পাত করে। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এরূপ হয় কেন? তিনি বললেন ঃ কোরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানলে ফেরেশতা রহমতের দোয়া করে, নতুবা অভিসম্পাত করে।

জনৈক আলেম বলেন ঃ মানুষ কোরান তেলাওয়াত করে এবং অজ্ঞাতে নিজেকে অভিসম্পাত করে। অর্থাৎ সে বলে ঃ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ খবরদার, যালেমের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, অথচ যালেম সে নিজেই। সে নিজের উপর যুলুম করে। সে আরও বলে ঃ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ খবরদার মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত; অথচ সে নিজেই একজন মিথ্যাবাদী। হযরত হাসান বসরী বলেনঃ তোমরা কোরআনকে মনযিল এবং রাত্রিকে উট সাব্যস্ত করেছ। উটে সওয়ার হয়ে মনযিল অতিক্রম কর। তোমাদের পূর্ববর্তীরা কোরআনকে পালনকর্তার ফরমান মনে করত। তারা রাতে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করত এবং দিনে তা পালন করত।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন অনুযায়ী আমল করার জন্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু লোকেরা এর পড়া ও পড়ানোকেই আমল মনে করে নিয়েছে। এক ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআন পাঠ করে এবং এর একটি হরফও ছাড়ে না; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না।

হযরত ইবনে ওমর ও জুন্দুব (রাঃ)-এর হাদীসে আছে– আমাদের এত বয়স হয়েছে। আমাদের সময়ে মানুষ কোরআনের পূর্বে ঈমান লাভ করত। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কোন সূরা নাযিল হত, তখন তারা সেই সূরার হালাল ও হারাম শিখত, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবগত হত এবং বিরতির স্থান সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করত; কিন্তু এর পরে আমরা এমন লোক দেখেছি যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়েছে। তারা আলহামদু

থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত পড়ে যায়; কিন্তু এতে আদেশ নিষেধের আয়াত কোন্‌টি এবং বিরতির জায়গা কোথায় তা কিছুই বুঝে না, ব্যস কেবল ঘাসের মত কেটে চলে যায়।

তওরাতে বর্ণিত আছে– আল্লাহ বলেন ঃ হে আমার বান্দারা, তোমাদের লজ্জা নেই; পথে চলা অবস্থায় যদি কারও চিঠি তোমাদের হাতে আসে, তোমরা পথের পার্শ্বে চলে যাও এবং চিঠির এক একটি শব্দ পাঠ কর। তার কোন মর্ম ছাড় না। অথচ আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব নাযিল করেছি। এতে এক একটি বিষয় একাধিকবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করেছি, যাতে তোমরা তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হৃদয়ঙ্গম কর; কিন্তু তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি কি তোমাদের কাছে পত্রদাতার চেয়ে অধম হয়ে গেলাম? তার পত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ কর আর আমার কিতাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর? তোমাদের কোন ভাই মাঝখানে কথা বললে তাকে থামিয়ে দাও। আমিও তোমাদের প্রতি অভিনিবেশ করি এবং তোমাদের সাথে কথা বলি; কিন্তু তোমরা মনে প্রাণে আমার দিক থেকে বিমুখ থাক। আমার মর্যাদা কি তোমাদের ভাইয়ের সমানও নয়?

তেলাওয়াতের বাহ্যিক আদব

যে তেলাওয়াত করবে, তার ওযু থাকতে হবে। সে দণ্ডায়মান হোক অথবা উপবিষ্ট, উভয় অবস্থায় আদব ও গাম্ভীর্য থাকতে হবে। চারজানু হয়ে, বালিশে হেলান দিয়ে অহংকারের ভঙ্গিতে বসবে না। একাকী এমনভাবে বসবে, যেমন ওস্তাদের সামনে বসা হয়। তেলাওয়াতের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করা। এরূপ তেলাওয়াত সর্বোত্তম আমল। যদি ওযু ছাড়া শুয়ে শুয়ে কোরআন পড়া হয়, তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ওযুসহ দাঁড়িয়ে পড়ার মত সওয়াব হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

যারা আল্লাহর যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে, পার্শ্বের উপর শুয়ে এবং পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর সৃজন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

এ আয়াতে সকল অবস্থারই প্রশংসা করা হয়েছে; কিন্তু দাঁড়িয়ে যিকির করার কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে, সে প্রত্যেক হরফের বদলে একশ'টি সওয়াব পায়। যে নামাযে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে সে প্রত্যেক হরফের বদলে পঞ্চাশটি সওয়াব পায় এবং যে ওযু ছাড়া পাঠ করে সে দশটি নেকী পায়। রাতের বেলায় নামাযে দাঁড়িয়ে পড়া সর্বোত্তম। কেননা, রাতের বেলায় মন খুব একাগ্র থাকে । হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ রাতের বেলায় বেশীক্ষণ দাঁড়ানো ভাল এবং দিনের বেলায় অধিক সেজদা ভাল। কেরাআত কম-বেশী পাঠ করার ব্যাপারে মানুষের অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন। কেউ দিবারাত্রির মধ্যে এক খতম করে, কেউ দু'খতম এবং কেউ তিন খতম পর্যন্ত করেছেন। আবার কেউ এক মাসে এক খতম করে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি অনুসরণ করা উত্তম ঃ من قرا القران فی اقل من ثلاث لم يفقهه -

যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কোরআন খতম করে, সে কোরআন বুঝে না। কারণ, এর বেশী পাঠ করা যথার্থ তেলাওয়াতের পরিপন্থী। হযরত আয়েশা (রাঃ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে শুনলেন, সে অত্যন্ত দ্রুত কোরআন পাঠ করে । তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি কোরআনও পড়ে না– চুপ করেও থাকে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে ওমরকে বললেন ঃ সপ্তাহে এক খতম কর। কয়েকজন সাহাবী এরূপই করতেন। যেমন হযরত ওসমান (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), ইবনে মসঊদ (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ। মোট কথা, কোরআন খতমের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম, দিবা-রাতে এক খতম করা। একে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন। দ্বিতীয়, প্রত্যহ এক পারা পড়ে মাসে এক খতম করা। এ পরিমাণটি খুবই কম, যেমন প্রথমটি খুবই বেশী। তৃতীয়, সপ্তাহে এক খতম করা। চতুর্থ, সপ্তাহে দু'খতম করা, যাতে তিন দিনের কাছাকাছি

সময়ে এক খতম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মোস্তাহাব হচ্ছে, এক খতম দিনে শুরু করবে এবং এক খতম রাতে। দিনের খতমকে সোমবারে ফজরের দু'রাকআতে অথবা দু'রাকআতের পরে আর রাতের খতম জুমআর দিনের রাতে মাগরিবের দু'রাকআতে অথবা দু'রাকআতের পরে সমাপ্ত করবে। যাতে দিনের শুরুতে এবং রাতের শুরুতে উভয় খতম সমাপ্ত হয়। কেননা, রাতে খতম হলে ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াতকারীর জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং দিনে খতম হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দোয়া করতে থাকে। সুতরাং দিন ও রাত্রির শুরুভাগে খতম করার ফায়দা এই যে, ফেরেশতাদের দোয়ার বরকত সমগ্র রাত ও দিনে পরিব্যাপ্ত হবে।

কতটুকু পড়তে হবে, এর বিবরণ হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী যদি আবেদ হয় এবং আমলের সাহায্যে আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করতে চায়, তবে এক সপ্তাহে দু'খতমের কম পড়বে। আর যদি শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে এক সপ্তাহে এক খতম করলেও দোষ নেই। যদি কেউ কোরআনের অর্থে চিন্তাভাবনা করে তেলাওয়াত করে, তবে একমাসে এক খতমই যথেষ্ট। কারণ, তাকে বার বার পড়তে হবে এবং অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

যে ব্যক্তি সপ্তাহে এক খতম করবে, সে কোরআনকে সাতটি মনযিলে ভাগ করে নেবে। সাহাবায়ে কেরামও এরূপ মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত ওসমান (রাঃ) জুমআর রাতে শুরু থেকে সূরা মায়েদার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন এবং শনিবার রাতে আনআম থেকে সূরা হুদ পর্যন্ত, রবিবার রাতে সূরা ইউসুফ থেকে মারইয়াম পর্যন্ত, সোমবার রাতে তোয়াহা থেকে কাসাস পর্যন্ত, মঙ্গলবার রাতে আনকাবুত থেকে সোয়াদ পর্যন্ত, বুধবার রাতে যুমার থেকে আররাহমান পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াকেয়া থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ইবনে মসউদও সাত মনযিলেই তেলাওয়াত সমাপ্ত করতেন; কিন্তু তাঁর ক্রম পৃথক ছিল। কোরআনের সাতটি মনযিল রয়েছে– প্রথম মনযিল সূরা ফাতেহা থেকে তিন সূরার,

দ্বিতীয় মনযিল পাঁচ সূরার, তৃতীয় মনযিল সাত সূরার, চতুর্থ মনযিল নয় সূরার, পঞ্চম মনযিল এগার সূরার, ষষ্ঠ মনযিল তের সূরার এবং সপ্তম মনযিল সূরা কাফ থেকে পরবর্তী সূরাসমূহের। এটা কোরআনের এক পঞ্চমাংশ, এক দশমাংশ ও অন্যান্য অংশে বিভক্ত হওয়ার পূর্বেকার কথা। এগুলো পরবর্তী সময়ে স্থিরীকৃত হয়েছে।

লেখার ব্যাপারে মোস্তাহাব হচ্ছে, কোরআন মজীদ পরিষ্কার ও ঝকঝকে অক্ষরে লেখবে। লাল কালি দিয়ে নোক্তা ও চিহ্ন সংযোজন করায় দোষ নেই। এ কাজ পাঠককে ভুল পাঠ থেকে রক্ষা করে। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন (রঃ) কোরআন মজীদকে এক পঞ্চমাংশ, এক দশমাংশ ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করা খারাপ মনে করতেন। শা'বী ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরাও লাল কালি দিয়ে নোক্তা সংযোজন করতেন। তাঁরা বলতেন ঃ কোরআন মজীদকে পরিষ্কার ও ঝকঝকে রাখ। যাঁরা এসব বিষয় মাকরূহ বলতেন, সম্ভবতঃ তাঁদের যুক্তি ছিল, এভাবে ক্রমশঃ বাড়াবাড়ির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তাই এতে কোন দোষ না থাকলেও বাড়াবাড়ির পথ রুদ্ধ করা এবং পরিবর্তনের কবল থেকে কোরআনকে রক্ষা করার জন্যে তারা নোক্তা সংযোজন করাও মাকরূহ বলতেন; কিন্তু যেক্ষেত্রে এসব দ্বারা কোন অনিষ্ট হয়নি এবং সকলের মতে স্থির রয়েছে যে, এগুলো দ্বারা অক্ষর সনাক্ত করা সহজ হয়, তখন এগুলোর ব্যবহারে কোন দোষ নেই এবং এগুলো নবাবিষ্কৃত হওয়ায়ও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেননা, অধিকাংশ নবাবিষ্কৃত বিষয় ভাল। সেমতে তারাবীহ্ সম্পর্কে বলা হয়, এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আবিষ্কার এবং চমৎকার আবিষ্কার। এটা ভাল বেদআত। খারাপ বেদআত সে বেদআতকে বলা হয় যা সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায় এবং সুন্নতকে বদলে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলতেন– আমি নোক্তা সংযোজিত কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকি; কিন্তু নিজে তাতে সংযোজন করি না। আওযায়ী ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেন– কোরআন প্রথমে মাসহাফের মধ্যে সাফ (নোক্তাবিহীন) ছিল। সর্বপ্রথম তাতে 'বা' ও 'তা'

অক্ষরে নোক্তা সংযোজন করা হয়। এতে কোন দোষ নেই; বরং এটা কোরআনের আলো। এর পর আয়াতের শেষে বড় বিন্দু আবিষ্কৃত হয়। এতেও কোন দোষ নেই। এর মাধ্যমে আয়াতসমূহের শুরু জানা যায়। এর পর শেষ ও সূচনার চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হয়।

আবু বকর বয়লী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মাসহাফে এ'রাব (স্বরচিহ্ন তথা যের, যবর, পেশ) সংযোজন করা কেমন? তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই।

খালেদ খাদ্দা বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে সিরীনের খেদমতে হাযির হয়ে দেখি, তিনি এ'রাব সংযোজিত কোরআন মজীদ পাঠ করছেন। অথচ তিনি এ'রাবকে খারাপ মনে করতেন। কথিত আছে, এ'রাব হাজ্জাজের আবিষ্কৃত । সে কারীদেরকে একত্রিত করে। তারা কোরআনের শব্দ ও অক্ষর গণনা করে তা সমান ত্রিশ পারায় ভাগ করে এবং এক চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ ইত্যাদি চিহ্ন সংযুক্ত করে।

কোরআন মজীদ থেমে থেমে উত্তমরূপে পড়া মোস্তাহাব। কেননা পড়ার উদ্দেশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা। থেমে থেমে উত্তমরূপে পড়লে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাওয়া যায়। এ কারণেই হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কেরাআতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ দ্রুতবেগে সমগ্র কোরআন পড়ে যাওয়ার তুলনায় থেমে থেমে কেবল সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান পাঠ করা আমার কাছে অধিক ভাল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি যদি সূরা যিলযাল ও সূরা কারেয়া বুঝে শুনে পাঠ করি, তবে এটা সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান টেনে হেঁচড়ে পাঠ করার চেয়ে উত্তম মনে করি। মুজাহিদ (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দু'ব্যক্তি নামাযে একত্রে দাঁড়িয়ে একজন কেবল সূরা বাকারা পাঠ করল এবং অন্যজন সমগ্র কোরআন পড়ে নিল। তাদের মধ্যে কে বেশী সওয়াব পাবে ? তিনি বললেন ঃ উভয়েই সমান সওয়াব পাবে। স্মর্তব্য, অর্থ বুঝার কারণেই কেবল থেমে থেমে পড়া

মোস্তাহাব নয়। কেননা, যে ব্যক্তি আরব নয়, সে আরবী ভাষা বুঝে না। সে কোরআনের অর্থ কিরূপে বুঝবে? অথচ থেমে থেমে পড়া তার জন্যও মোস্তাহাব । আসলে থেমে থেমে পড়ার মধ্যে কোরআনের সম্মান ও ইজ্জত বেশী হয়। দ্রুত পড়ার তুলনায় এর তাসিরও বেশী হয়।

তেলাওয়াতের সাথে ক্রন্দন করা মোস্তাহাব । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন পড় আর ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে না পার তবে কাঁদার মত আকৃতি ধারণ কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালেহ মুররী বলেন ঃ আমি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে কোরআন পড়েছি। তিনি শুনে বললেন ঃ সালেহ, এটা তো কেরাআত হল। কান্না কোথায়? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি সেজদার আয়াত পাঠ কর, তখন না কেঁদে সেজদা করো না। যদি তোমাদের কারও চোখ থেকে অশ্রু বের না হয়, তবে অন্তরে ক্রন্দন করা উচিত। ইচ্ছা করে কান্নার উপায় হচ্ছে মনে বেদনাবোধ উপস্থিত করা। কেননা, বেদনা থেকেই কান্নার উৎপত্তি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন বেদনা সহকারে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমরা সেভাবেই কোরআন পড়। মনে বেদনাবোধ উপস্থিত করার পন্থা হচ্ছে কোরআনের ধমক, সতর্কবাণী, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা এবং কোরআনের আদেশ নিষেধ পালনে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি'র কথা চিন্তা করা। এতে অবশ্যই দুঃখ কান্না সৃষ্টি হবে। যদি এর পরও দুঃখ ও কান্না অন্তরে উপস্থিত না হয়, তবে তা অন্তরের একান্ত কঠোর হওয়ার আলামত। এ জন্যও ক্রন্দন করা উচিত।

আয়াতসমূহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ, সেজদার আয়াত পাঠ করলে সেজদা করবে অথবা অন্যের কাছে সেজদার আয়াত শুনলে যখন সে সেজদা করে, তখন শ্রোতাও করবে। তবে সেজদা করার জন্যে ওযু থাকা শর্ত। কোরআন মজীদে চৌদ্দটি সেজদার আয়াত আছে। সূরা হজ্জে দু'টি এবং সূরা সোয়াদে সেজদা নেই। [ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর মতেও মোট সেজদা চৌদ্দটি ; কিন্তু সূরা হজ্জের দু'টির স্থলে প্রথমটি এবং সূরা সোয়াদে একটি।] এ সেজদার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে

মাটিতে কপাল ঠেকানো এবং সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে তকবীর বলে সেজদা করা। সেজদার মধ্যে সেজদার আয়াতের সাথে মিল রেখে দোয়া করবে। উদাহরণতঃ যখন এই আয়াত পড়বে– خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পালনকর্তার প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এমতাবস্থায় যে, তারা অহংকার করে না।) তখন এই দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ وَعَلٰى اَوْلِيَائِكَ ـ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সেজদাকারীদের, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমি তোমার আদেশের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের দলভুক্ত হওয়া থেকে অথবা তোমার ওলীদের উপর বড়াইকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এমনিভাবে প্রত্যেক আয়াতের সামঞ্জস্য রেখে দোয়া পড়বে।

নামাযের জন্যে যা যা শর্ত, তেলাওয়াতের সেজদার জন্যেও তা শর্ত। অর্থাৎ, সতর আবৃত করা, কেবলামুখী হওয়া, কাপড় ও দেহ পবিত্র হওয়া ইত্যাদি । সেজদার আয়াত শুনার সময় যার ওযু থাকে না, সে যখন ওযু করবে তখন সেজদা করবে। কেউ কেউ তেলাওয়াতের সেজদা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্যে বলেছেন, হাত তুলে তাহরীমার নিয়ত করার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে, এর পর সেজদার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে, এর পর মাথা তোলার জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে এবং সব শেষে সালাম ফেরাবে। কেউ কেউ তাশাহ্হুদ পড়ার কথাও বলেছেন; কিন্তু নামাযের সাথে মিল দেখানো ছাড়া এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে এরূপ মিল দেখানো অবান্তর । কেননা, এতে কেবল সেজদারই আদেশ আছে। তাই এ শব্দেরই অনুসরণ করা উচিত; কিন্তু সেজদায় যাওয়ার

জন্যে শুরুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহু আকবার বলা সমীচীন। এছাড়া অন্যান্য বিষয় অবান্তর মনে হয়। তেলাওয়াত শুরু করার সময় আদব হচ্ছে একথা বলা ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করি। হে প্রভু, শয়তানদের প্ররোচনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে হে প্রভু, ওরা আমার কাছে হাযির হওয়া থেকে ।

এর পর সূরা নাস ও সূরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং প্রত্যেক সূরা শেষে বলবে ঃ

صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَلَّغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِهٖ وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَىَّ الْقَيُّوْمَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা পৌঁছিয়েছেন। ইলাহী, তুমি এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত কর। এর মাধ্যমে আমাদেরকে বরকত দাও। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র । আমি শক্তিশালী চিরজীবী আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি।

তেলাওয়াতের মধ্যে তসবীহ তথা পবিত্রতাসূচক আয়াত এলে বলবে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ মহান। দোয়া এবং এস্তেগফারের আয়াত এলে দোয়া ও এস্তেগফার পড়বে। আশার আয়াত এলে আশা করবে এবং ভয়ের আয়াত এলে আশ্রয় চাইবে। এগুলো মুখে বলবে অথবা মনে মনে কামনা করবে। হযরত হুযায়ফা বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা শূরু করে যখনই কোন রহমতের আয়াত পড়েছেন, রহমত প্রার্থনা করেছেন। যখনই

আযাবের আয়াত পড়েছেন, আশ্রয় চেয়েছেন এবং যখনই পবিত্রতার আয়াত পাঠ করেছেন, সোবহানাল্লাহ্ বলেছেন। তেলাওয়াত সমাপ্ত হলে পর সেই দোয়া পড়বে, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খতমের সময় পড়তেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কোরআন দ্বারা আমার প্রতি রহম কর। কোরআনকে আমার জন্যে ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমতে পরিণত কর। হে আল্লাহ্, আমি এর যতটুকু বিস্মৃত হয়েছি, তা স্মরণ করিয়ে দাও, যতটুকু শিখতে পারিনি তা শিখিয়ে দাও এবং আমাকে এর তেলাওয়াত নসীব কর, দিবা ও রাত্রির ক্ষণসমূহে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায়। একে আমার জন্যে প্রমাণ বানাও হে বিশ্ব পালক!

কেরাআত এতটুকু সশব্দে পড়া অবশ্য জরুরী যতটুকুতে নিজে শুনতে পায়। কেননা, কেরাআত অর্থ সশব্দে হরফ উচ্চারণ করা। নিজে শুনা এর সর্বনিম্ন স্তর। যে কেরাআত নিজে শুনে না তা দ্বারা নামায হবে না। এতটুকু সশব্দে পড়া, যা অপরে শুনে, তা একদিক দিয়ে ভাল এবং একদিকে মন্দ। আস্তে পড়া যে মোস্তাহাব, তা এই রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় – রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আস্তে পড়া সশব্দে পড়ার উপর এমন ফযীলত রাখে, যেমন গোপনে সদকা করা প্রকাশ্যে সদকা করার উপর ফযীলত রাখে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– সশব্দে কোরআন পাঠকারী এমন, যেমন প্রকাশ্যে সদকা দানকারী। এক হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে– গোপন আমল প্রকাশ্য আমল অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী। অনুরূপভাবে আরও এরশাদ হয়েছে– خير الرزق ما يكفى وخير الذكر الخفى উত্তম রিযিক যা পরিতুষ্টি আনে এবং উত্তম যিকির যা গোপনে হয়।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে কেরাআত প্রতিযোগিতা করে সশব্দে পড়ো না। এক রাতে সায়ীদ ইবনে মূসাইয়েব (রাঃ) মসজিদে নববীতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে সজোরে কোরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। সায়ীদ ইবনে মূসাইয়েব তাঁর গোলামকে বললেন ঃ এ নামাযীর কাছে গিয়ে তাকে নীচু স্বরে কেরাআত পড়তে বল। গোলাম বলল ঃ মসজিদ তো আমাদের একার নয়। এ ব্যক্তিরও এতে নামায পড়ার অধিকার আছে। আমি কিরূপে তাকে নিষেধ করব? অতঃপর হযরত সায়ীদ উচ্চ স্বরে বললেন ঃ হে নামাযী, তোমার যদি নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে আওয়ায নীচু কর। আর যদি মানুষকে শুনানো মকসুদ হয়, তবে আল্লাহ তাআলার কাছে এটা তোমার কোন উপকারে আসবে না। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ চুপ হয়ে গেলেন। তিনি সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে জুতা নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তিনি তখন মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসক ছিলেন।

সশব্দে পড়া যে মোস্তাহাব, তা এই হাদীস দ্বারা জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কয়েকজন সাহাবীকে রাতের নামাযে সশব্দে কেরাআত পড়তে শুনে তা সঠিক বলে অভিহিত করেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠে নামায পড়ে, তখন যেন কেরাআত সশব্দে পড়ে। কেননা, ফেরেশতারা এবং সে গৃহের জ্বিনরা তার কেরাআত শুনে এবং সেই নামায তারাও পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁর তিন জন সাহাবীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তিনি হযরত আবু বকরকে খুব আস্তে আস্তে কেরাআত পড়তে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি যার সাথে কথা বলছি, তিনি অবশ্যই আমার কথা শুনেন। অতঃপর তিনি

হযরত ওমরকে সজোরে কেরাআত পড়তে দেখেন এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত ওমর বললেন ঃ আমি নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করি এবং শয়তানকে বিব্রত করি। অতঃপর তিনি হযরত বেলালকে দেখেন, তিনি এক সূরার কয়েক আয়াত এবং অন্য এক সূরার কয়েক আয়াত পাঠ করছেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের সাথে যুক্ত করছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জন সম্পর্কেই বললেন ঃ তোমরা চমৎকার কাজ করছ। যখন সরব ও নীরব উভয় প্রকার কেরাআতের পক্ষে হাদীস বিদ্যমান তখন উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, আস্তে পাঠ করা রিয়া থেকে অধিকতর দূরবর্তী । এতে কৃত্রিমতার অবকাশ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের জন্যে রিয়া ও কৃত্রিমতার আশংকা করে, তার জন্যে আস্তে পড়াই উত্তম। আর যদি কেউ এরূপ আশংকা না করে এবং সজোরে পাঠ করলে অপরের পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তবে তার জন্যে সজোরে পাঠ করা উত্তম। কেননা, এতে আমল বেশী হয় এবং এর উপকার অন্যেরাও পায়। বলাবাহুল্য, যে কল্যাণ অন্যেরাও পায়, তা সেই কল্যাণ থেকে শ্রেষ্ঠ, যা কেবল একজনে পায়। এছাড়া সরব কেরাআত পাঠকের মনকে হুশিয়ার রাখে এবং তাকে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য একাগ্র করে। আরও আশা থাকে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি কেরাআত শুনে জেগে উঠবে এবং এবাদতে মশগুল হবে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, কোন গাফেল ব্যক্তি পাঠককে দেখে হুঁশিয়ার হয়ে যায়। সে প্রভাবান্বিত হয় এবং কিছু করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। সুতরাং এসব নিয়তের কোন একটি নিয়ত থাকলে সরবে পাঠ করা উত্তম। । আর যদি সবগুলো নিয়তের সমাবেশ ঘটে, তবে সওয়াবও বহুগুণ বেড়ে যাবে। কেননা, নিয়ত অধিক হলে আমলও অধিক হয় এবং সওয়াব বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই আমরা বলি, মাসহাফ দেখে কোরআন পাঠ করা মুখস্থ পাঠ করার চেয়ে উত্তম। কেননা, এতে চোখের দেখা অতিরিক্ত আমল । তাই সওয়াবও অতিরিক্ত হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ দেখে কোরআন পাঠ করার সওয়াব সাত গুণ বেশী । কেননা, মাসহাফ দেখাও এবাদত। হযরত ওসমান (রাঃ) এত বেশী

মাসহাফ দেখে তেলাওয়াত করতেন যে, তাঁর কাছে দু'টি মাসহাফ ছিঁড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সাহাবী দেখেই কোরআন পাঠ করতেন। যেদিন মাসহাফ দেখা হত না, সেদিনকে তাঁরা খারাপ মনে করতেন। মিসরের জনৈক ফেকাহবিদ সেহরীর সময় হযরত ইমাম শাফেয়ীর কাছে আগমন করেন। তখন তাঁর সামনে কোরআন খোলা ছিল। ইমাম শাফেয়ী ফেকাহবিদকে বললেন ঃ ফেকাহ তোমাকে কোরআন থেকে বিরত রেখেছে। আমাকে দেখ, আমি এশার নামায পড়ে সামনে কোরআন রাখি, আর ভোর পর্যন্ত তা বন্ধ করি না। মধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করা এবং সাজিয়ে গুছিয়ে কেরাআত উচ্চারণ করা উচিত; কিন্তু অক্ষরগুলো এত বেশী টেনে পড়া উচিত নয় যাতে শব্দ বদলে যায় অথবা তার গাঁথুনি বিনষ্ট হয়ে যায়; বরং এক প্রকার সজ্জিত করে কেরআন পাঠ করবে। এটা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ زينوا القران باصواتكم

তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কোরআনকে সজ্জিত কর। তিনি আরও বলেন ঃ ما اذن الله لشئ ما اذن لنبي يتغنى بالقران

আল্লাহ্ তাআলা কোন বিষয়ের এতটুকু আদেশ দেননি, যতটুকু সুললিত কণ্ঠে কোরআন পড়ার জন্যে কোন পয়গম্বরকে আদেশ দিয়েছেন। আরও এরশাদ হয়েছে– ليس منا من لم يتغنى بالقران যে সুললিত স্বরে কোরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বর্ণিত আছে, এক রাতে রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি অনেক বিলম্বে আগমন করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমি এক ব্যক্তির কেরাআত শুনছিলাম। এমন মধুর কণ্ঠ ইতিপূর্বে আমি শুনিনি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উঠে সেখানে পৌঁছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লোকটির কেরাআত শুনে ফিরে এলেন। অতঃপর বললেন ঃ লোকটি আবু হুযায়ফার মুক্ত গোলাম। আল্লাহ্র শোকর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন। অন্য এক রাতে রসূলে

আকরাম (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদের তেলাওয়াত শ্রবণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনার পর তিনি বললেন ঃ

من اراد ان يقرا القران عفنا كما انزل فليقراه على قراءة ابن عم عبد ـ

যে ব্যক্তি ধীরে ও সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পড়তে চায়, যেমনটি অবতীর্ণ হয়েছে, সে যেন ইবনে মসঊদের কেরাআতের মত করে পড়ে।

একবার রসূলে করীম (সাঃ) ইবনে মসঊদকে বললেন ঃ আমাকে কোরআন শুনাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি তো কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আপনাকে শুনাব কি করে? তিনি বললেন ঃ অন্যের মুখ থেকে কোরআন শ্রবণ করা আমার পছন্দনীয়। এর পর ইবনে মসঊদ কোরআন পড়ে যাচ্ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্রু বহাচ্ছিলেন। একবার হযরত আবু মূসা আশআরীর কোরআন পাঠ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এ লোকটি দাঊদ (আঃ) পরিবারের কিছু লাহান প্রাপ্ত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে আবু মূসা আশআরী আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি শুনছেন জানতে পারলে আমি আপনার জন্যে আরও সুন্দর করে পাঠ করতাম। কারী হায়সাম বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একবার স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে এরশাদ করলেন ঃ হায়সাম, তুমিই কোরআনকে আপন কণ্ঠস্বর দ্বারা সজ্জিত করে থাক? আমি আরজ করলাম ঃ জি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কোন সমাবেশে একত্রিত হতেন, তখন একজনকে কোরআনের কোন সূরা পাঠ করতে বলতেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসাকে বলতেন ঃ আমাদের পালনকর্তার কথা স্মরণ করাও। তিনি তার সামনে এতক্ষণ কোরআন পাঠ করতেন যে, নামাযের সময় পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হত। তখন লোকেরা তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলতেন ঃ আমরা কি নামাযে নই? এটা ছিল আল্লাহ্ তায়ালার সেই এরশাদের প্রতি

ইঙ্গিত وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (আল্লাহ্‌র স্মরণই বড়)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত শুনবে, সেটা তার জন্যে কেয়ামতের দিন নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হবে। শ্রোতার জন্যে এত সওয়াব হলে পাঠকের জন্যে কি পরিমাণ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তেলাওয়াতের আভ্যন্তরীণ আদব

প্রথমতঃ খোদায়ী কালামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ ও কৃপা উপলব্ধি করতে হবে যে, তিনি সুউচ্চ আরশ থেকে এই কালামকে মানুষের বোধগম্য করে অবতীর্ণ করেছেন। এটা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার একটা মেহেরবানী যে, যে কালাম ছিল তাঁর চিরন্তন সিফত ও সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তার অর্থসম্ভার তিনি মানুষের বোধগম্য করে দিয়েছেন। এখন এই সিফত অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের সাথে জড়িত হয়ে মানুষের জন্যে দেদীপ্যমান হয়ে গেছে। অথচ অক্ষর ও কণ্ঠস্বর হল মানুষের সিফত বা বৈশিষ্ট্য; কিন্তু মানুষ নিজের সিফতকে মাধ্যম না বানিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সিফত হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয় বিধায় খোদায়ী সিফতকে অক্ষর ও কণ্ঠস্বরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। যদি এরূপ করা না হত, তবে আরশও এই কালাম শ্রবণ করে স্থির থাকতে পারত না এবং মর্ত্যলোকেরও তা শুনার সাধ্য হত না; বরং তার মহিমা ও নূরের কিরণে আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত সবকিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সুদৃঢ় না রাখলে তিনি তাঁর কালাম শুনার মত শক্তি সাহস পেতেন না; যেমন তাঁর সামান্য দ্যুতি সহ্য করার শক্তি তূর পাহাড়ের হয়নি এবং পাহাড় ভেঙ্গে খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। খোদায়ী কালামের মহিমা এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝতে হবে, যা মানুষের বোধশক্তির অন্তর্গত। তাই জনৈক সাধক একে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, লওহে মাহফুযে কালামে ইলাহীর প্রত্যেকটি অক্ষর কাফ পর্বতের চেয়েও বৃহৎ। যদি সকল ফেরেশতা একযোগে এর একটি অক্ষর বহন করতে চায়, তাবে তা বহন

করার শক্তি তাদের হয় না। অবশেষে লওহে মাহফুযের ফেরেশতা ইসরাফীল (আঃ) এসে তা বহন করেন। তার বহন করাও আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে– নিজস্ব শক্তি বলে নয়; আল্লাহ্ তাআলা তাকে তা বহন করার শক্তি দান করেছেন এবং এতে তাঁকে নিয়োজিত রেখেছেন।

খোদায়ী কালাম মহামহিমান্বিত । এর তুলনায় মানুষের বোধশক্তি খুবই নিম্ন পর্যায়ের। এতদসত্ত্বেও এ কালাম যে মানুষের বোধগম্য হয়েছে, জনৈক দার্শনিক এর একটি চমৎকার কারণ ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, তিনি জনৈক বাদশাহকে পয়গম্বরগণের শরীয়ত অনুসরণ করতে বললে বাদশাহ তাঁকে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। দার্শনিক প্রশ্নগুলোর এমন উত্তর দিলেন, যা বাদশাহের বোধগম্য হতে পারে। অতঃপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলুন তো, আপনারা পয়গম্বরগণের আনীত কালাম সম্পর্কে দাবী করেন যে, এটা মানুষের কালাম নয়; বরং আল্লাহ তাআলার কালাম । তা হলে এ কালাম মানুষ বুঝে কিরূপে? দার্শনিক জওয়াব দিলেন ঃ আমরা দেখি, মানুষ যখন কোন চতুষ্পদ জন্তু অথবা পক্ষীকে সামনে অগ্রসর হওয়া, পেছনে সরে যাওয়া, সম্মুখে মুখ করা অথবা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ইত্যাদি বুঝাতে চায়, তখন অবশ্যই তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে নেমে যেতে হয় এবং আপন উদ্দেশ্য এমন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হয়, যা জন্তুদের বোধগম্য ; যেমন টক টক করা, শীস দেয়া, হুমহুম বলা ইত্যাদি । অনুরূপভাবে মানুষও আল্লাহর কালাম পূর্ণাঙ্গরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। ফলে পয়গম্বরগণও মানুষের সাথে সে কৌশলই অবলম্বন করেন যা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে অবলম্বন করে। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহর কালাম মানুষের বোধগম্য অক্ষরের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। প্রজ্ঞাবোধক অর্থসম্ভার এসব অক্ষরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে বিধায় এসব অর্থসম্ভারের মহিমায় কালাম মহিমান্বিত হয়। সুতরাং স্বর যেন প্রজ্ঞাবোধক অর্থসম্ভারের দেহ ও গৃহ আর প্রজ্ঞা হল স্বরের আত্মা ও প্রাণ। মানুষের দেহ যেমন আত্মা থাকার কারণে সম্মানিত ও সম্ভ্রমযুক্ত হয়, তেমনি কালামের স্বর এবং

অক্ষরসমূহও অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার কারণে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়। প্রজ্ঞার কালাম সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে আদেশ প্রদানকারী, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও প্রশংসনীয় সাক্ষী হয়ে থাকে। এ থেকেই আদেশ ও নিষেধ নির্গত হয়। মিথ্যার সাধ্য নেই, প্রজ্ঞাপূর্ণ কালামের সামনে টিকে থাকে, যেমন ছায়া সূর্য কিরণের সামনে টিকে থাকতে পারে না। মানুষ প্রজ্ঞার সকল স্তর অতিক্রম করার শক্তি রাখে না, যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্যের দেহ অতিক্রম করতে পারে না; কিন্তু সূর্যের আলো মানুষ ততটুকুই পায়, যতটুকু দ্বারা তাদের চক্ষু আলোকিত হয় এবং কেবল আপন প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দেখে নেয়। মোট কথা, খোদায়ী কালামকে এমন একজন বাদশাহ বুঝতে হবে, যার মুখমন্ডল অজ্ঞাত; কিন্তু আদেশ অব্যাহত। অথবা এমন সূর্য ভাবতে হবে, যার মূল উপাদান আগোচরে, কিন্তু আলো দেদীপ্যমান। অথবা এমন একটি উজ্জ্বল তারকা মনে করতে হবে, যাকে দেখে সে ব্যক্তিও পথ পেয়ে যায় যে তার গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না।

সারকথা, খোদায়ী কালাম উৎকৃষ্ট ধনভান্ডারসমূহের চাবিকাঠি এবং এমন আবে হায়াত, যে ব্যক্তি এ থেকে পান করে সে অমর হয়ে যায় এবং এটা এমন মহৌষধ, যে ব্যক্তি এটা সেবন করে, সে কখনও রুগ্ন হয় না।

কালামকে বুঝার জন্যে দার্শনিকের এ বর্ণনা একটি ক্ষুদ্র বিষয়। এলমে মোয়ামালায় এর বেশী বর্ণনা করা সমীচীন নয় বিধায় আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হলো।

দ্বিতীয়তঃ তেলাওয়াতকরীর উচিত তেলাওয়াত শুরু করার সময় আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত করা এবং একথা জানা যে, সে যা পাঠ করছে তা মানুষের কালাম নয়। কালামে পাকের তেলাওয়াতে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ। যারা পাক পবিত্র, তারাই কেবল কোরআন স্পর্শ করবে। কোরআনের বাহ্যিক জিলদ ও পাতাসমূহ যেমন মানুষ পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি এর আভন্তরীণ অর্থও যাবতীয় অপবিত্রতা

থেকে অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া এবং তাযীমের নূরে আলোকিত হওয়া ছাড়া আসতে পারে না। প্রত্যেক হাত যেমন কোরআনের জিলদ স্পর্শ করার যোগ্য নয়, তেমনি প্রত্যেক জিহবাও তার হরফসমূহ তেলাওয়াত করার কিংবা তার অর্থসম্ভার অর্জন করার সামর্থ্য রাখে না। এমনি ধরনের তাযীমের কারণে ইকরিমা ইবনে আবু জাহল যখন কোরআন খুলতেন, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়তেন এবং বলতেন– এটা আমার পরওয়ারদেগারের কালাম, এটা আমার প্রভুর কালাম।

সারকথা, কালামের মাহাত্ম্যের দ্বারা মুতাকাল্লিমের তথা আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য হয়। মুতাকাল্লিমের মাহাত্ম্য অন্তরে ততক্ষণ আসে না, যতক্ষণ না তাঁর গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। সুতরাং তেলাওয়াতকারী নিজের অন্তরে আরশ, কুরসী, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জ্বিন, মানব, জীবজন্তু ও বৃক্ষের কথা উপস্থিত করে ভাববে যে, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা, এগুলোর উপর ক্ষমতাবান এবং এগুলোর রুজিদাতা এক আল্লাহ্। সকলেই তাঁর কুদরতের অধীনে এবং তাঁর অনুগ্রহ, কৃপা, রহমত, আযাব ও প্রতাপের আওতাভুক্ত। তিনি নেয়ামত দিলে তা তাঁর কৃপা আর শাস্তি দিলে তা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। তিনি বলেন ঃ বেহেশতের জন্যে, আমার কোন পরওয়া নেই। কোন কিছুর পরওয়া না হওয়া খুবই মহত্ত্বের কথা। এসব বিষয় চিন্তা করলে মুতাকাল্লিমের মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত হয়। এর পর কালামের মাহাত্ম্য তাতে স্থান পায়।

তৃতীয়তঃ তেলাওয়াতের সময় অন্তর উপস্থিত থাকা এবং অন্য কোন চিন্তা মনে না থাকা উচিত। কোরআনে আছে– يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ قوة বলে চেষ্টা ও অধ্যবসায় বুঝানো হয়েছে। চেষ্টা অধ্যবসায় সহকারে কিতাব গ্রহণ করার অর্থ কিতাব পাঠ করার সময় সকল চিন্তাভাবনা ও হিম্মত কিতাবের মধ্যেই ব্যাপৃত রাখা– অন্য কিছু চিন্তা না করা। জনৈক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোরআন মজীদ পাঠ করার সময় আপনি

মনে মনে অন্য কোন কথা চিন্তা করেন কিনা? তিনি বললেন ঃ কোরআনের চেয়ে বেশী অন্য কোন বিষয় আমার প্রিয় নয়, যার কথা আমি চিন্তা করব। জনৈক বুযুর্গ যখন কোন সূরা পাঠ করতেন এবং তাতে মন নিবিষ্ট হত না, তখন তা পুনরায় পাঠ করতেন। এটা কালামের তাযীম থেকে উৎপন্ন হয়। কেননা, মানুষ যে কালাম পাঠ করে, তার তাযীম করলে সে তার সঙ্গ লাভ করে এবং তার প্রতি গাফেল হয় না। কোরআন মজীদে মন লাগার মত বিষয়াদি রয়েছে। শর্ত, যোগ্য পাঠক হতে হবে।

চতুর্থতঃ পঠিত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এটা অন্তরের উপস্থিতি থেকে আলাদা বিষয়। মাঝে মাঝে তেলাওয়াতকারী কোরআন ব্যতীত অন্য বিষয় চিন্তা করে না; কিন্তু কোরআন কেবল মুখে উচ্চারণ করে, তার অর্থ বুঝে না। অথচ পাঠ করার উদ্দেশ্য অর্থ বুঝা এবং চিন্তাভাবনা করা। এ কারণেই কোরআন থেমে থেমে পড়া সুন্নত। বাহ্যতঃ থেমে থেমে পড়লে অন্তর চিন্তা করবে এবং বুঝতে থাকবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে এবাদত বুঝে-সুজে করা হয় না, তাতে বরকত হয় না এবং যে তেলাওয়াতে চিন্তাভাবনা নেই; তাতে কল্যাণ নেই। যদি তেলাওয়াতকারী পুনরায় তেলাওয়াত না করে অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করতে পারে, তবে পুনরায় তেলাওয়াত করা উচিত; কিন্তু ইমামের পেছনে এরূপ করা অনুচিত। কেননা, ইমামের পেছনে এক আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং ইমাম অন্য আয়াতে মশগুল হলে সেটা এমন হবে, যেমন কোন ব্যক্তি তার কানে একটি কথা বলার পর সে একথা নিয়েই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং অবশিষ্ট কথা কিছুই বুঝে না। এটা তখনও প্রযোজ্য, যখন ইমাম রুকুতে চলে যায় অথচ মোক্তাদী ইমামের পঠিত আয়াত সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে; বরং ইমাম যে রোকনে যায় এবং যা কিছু পড়ে, মোক্তাদী তাই চিন্তা করবে। অন্য কিছু চিন্তা করা কুমন্ত্রণার অন্তর্ভুক্ত। আমের ইবনে আবদে কায়স বলেন ঃ নামাযে আমার মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার মনে কি পার্থিব বিষয়াদির কুমন্ত্রণা দেখা দেয়? তিনি বললেন ঃ

পার্থিব বিষয়াদির কুমন্ত্রণার তুলনায় তো আমি যবেহ হয়ে যাওয়া উত্তম মনে করি; বরং ব্যাপার হচ্ছে, আমার অন্তর নিজের পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াতে ব্যাপৃত হয়ে যায় এবং ভাবতে থাকে, এখান থেকে কিরূপে ফিরবে। দেখ, এ বিষয়টিকেও তিনি কুমন্ত্রণা মনে করছেন। এ বিষয়টি হযরত হাসান বসরীর সামনে আলোচিত হলে তিনি বললেন ঃ যদি আমের ইবনে আবদে কায়সের এ অবস্থা সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করেননি। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করলেন এবং বিশ বার তার পুনরাবৃত্তি করলেন। এ পুনরাবৃত্তির কারণ এটাই ছিল যে, তিনি এর অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। হযরত আবু যর (রাঃ)-থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এক রাতে সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং সমস্ত রাত একই আয়াত বার বার পাঠ করলেন। আয়াতটি ছিল এই ঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

অর্থাৎ, যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

তামীমে দারী একবার এ আয়াতেই সমস্ত রাত অতিবাহিত করে দেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

অর্থাৎ, গোনাহগাররা কি ধারণা করে যে, আমি তাদেরকে সে ব্যক্তিদের মত করে দেব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে? তাদের জীবন মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের এ ফয়সালা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

একবার সায়ীদ ইবনে জুবায়ের এ আয়াতটি পাঠ করতে করতে

ভোর করে দেন- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (হে অপরাধীর দল, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।) জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি একটি সূরা শুরু করি, এতে এমন কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করি যে, ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সূরা শেষ হয় না। অন্য একজন বলেন ঃ যেসব আয়াত আমি বুঝি না এবং যেসব আয়াতে আমার মন বসে না, সেগুলো পাঠে সওয়াব হবে বলে আমি মনে করি না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ আমি এক আয়াত পাঠ করি এবং চার পাঁচ রাত এতেই অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি নিজে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ না করলে অন্য আয়াত পাঠ করার সুযোগই হয় না। জনৈক বুযুর্গ সূরা হুদেই ছয় মাস কাটিয়ে দেন। তিনি এ সূরাটিই বার বার পাঠ করেন। জনৈক সাধক বলেন ঃ আমার খতম একটি সাপ্তাহিক, একটি মাসিক, একটি বার্ষিক এবং একটি এমন, যা আমি ত্রিশ বছর ধরে শুরু করেছি, কিন্তু এখনও শেষ করতে পারিনি। অর্থাৎ, চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধান যত বেশী হয়, খতমের মেয়াদ ততই দীর্ঘ হয়ে যায়। তিতি আরও বলেন ঃ আমি নিজেকে মজুরের স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছি। তাই আমি রোজের কাজও করি, সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক হিসেবেও করি। পঞ্চমতঃ কোরআনের প্রত্যেক আয়াতের বিষয়বস্তু বের করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কেননা, কোরআনে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং পয়গম্বরগণের অবস্থা, তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি, তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী, আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ এবং জান্নাত ও দোযখের বিষয়স্তু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত উদাহরণতঃ এই ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।)

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ -

অর্থাৎ, তিনি বাদশাহ, সর্বপ্রকার দোষমুক্ত সত্তা, নিরাপত্তাদানকারী, পরাক্রমশালী, মহান।

সুতরাং এসব নাম ও সিফত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে, যাতে গোপন রহস্য প্রকাশ পায়। এগুলোর মধ্যে অনেক অর্থসম্ভার লুক্কায়িত রয়েছে যা তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। হযরত আলী (রাঃ) এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে কোন কথা গোপনে বলেননি, যা অন্যের কাছে প্রকাশ করেননি; কিন্তু সত্য, আল্লাহ তাআলা কোন কোন বান্দাকে কোরআন বুঝার ক্ষমতা দান করেন। সুতরাং হযরত আলী বর্ণিত এই বুঝার ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জ্ঞান কামনা করে, তার উচিত কোরআন মজীদের জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা। আল্লাহ্ তাআলার নাম ও সিফতসমূহের মধ্যে কোরআনের অধিকাংশ জ্ঞান নিহিত। এগুলোর মধ্যে থেকে অধিকাংশ লোক তাই জেনেছে, যা তাদের বোধশক্তির উপযুক্ত। তারা এগুলোর গভীরে পৌঁছাতে পারেনি।

আল্লাহ্ তাআলার ক্রিয়াকর্মের মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা, মৃত্যু দান করা ইত্যাদি। এসব ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নাম ও গুণাবলী বুঝা উচিত। কেননা, ক্রিয়া কর্তার অবস্থা জ্ঞাপন করে এবং ক্রিয়ার মাহাত্ম্য দিয়ে কর্তার মাহাত্ম্য জানা যায়। তাই ক্রিয়ার মধ্যে কর্তাকে প্রত্যক্ষ করা উচিত। শুধু ক্রিয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখবে না। কেননা, যে আল্লাহ্কে চেনে, সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁকে দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের দেখা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহকে দেখে না, সে যেন আল্লাহর পরিচয়ই পায়নি। যে আল্লাহকে চিনেছে, সে জানে, আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সকল বস্তু বাতিল এবং তাঁর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। এ বিষয়টি এলমে মোকাশাফার সূচনা। এ কারণেই তেলাওয়াতকারী যখন আল্লাহর এই এরশাদ পাঠ করে ঃ

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ - أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ - أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ -

অর্থাৎ, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা যে বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা যে পানি পান কর, তার ব্যাপারে চিন্তা করেছ কি? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তা লক্ষ্য করেছ কি?)

এসব আয়াত পাঠ করার সময় দৃষ্টিকে আগুন, পানি, বীজ বপন ও বীর্যপাত থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত নয়; বরং সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। উদাহরণতঃ বীর্য সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, বীর্য একই উপাদানে গঠিত ছিল। এ থেকে অস্থি, মাংস, শিরা, উপশিরা কিরূপে নির্মিত হল? বিভিন্ন আকারের মাথা, হাত, পা, কলিজা, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি কিরূপে গঠিত হল? এর পর তাতে শ্রবণ, দর্শন, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সদগুণাবলী এবং ক্রোধ, কাম, কুফর, মূর্খতা, পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বাজে তর্ক-বিতর্ক করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব কিরূপে সৃষ্টি হল? আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ -

অর্থাৎ, মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর সে হয়ে গেল সুস্পষ্ট তার্কিক।

মোট কথা, যখনই ক্রিয়াকে দেখবে, তখনই কর্তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। পয়গম্বরগণের অবস্থা যখন শুনবে, তাঁদের প্রতি কিভাবে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল, নির্যাতন করা হয়েছিল এবং কতককে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল, তখনই বুঝে নেবে, আল্লাহ্ তাআলা পরাঙ্মুখ। তিনি রসূলগণেরও মুখাপেক্ষী নন এবং তাদেরও মুখাপেক্ষী নন, যাদের প্রতি রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন । তিনি সকলকে ধ্বংস কর দিলে তাঁর রাজত্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা দেবে না। এর পর পরিণামে যখন পয়গম্বরগণকে সাহায্যদানের অবস্থা শুনবে তখন বুঝবে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি সত্যকে সাহায্যদান করেন।

আদ, সামুদ প্রভৃতি মিথ্যারোপকারী সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে আল্লাহ্

তাআলার প্রতাপ ও প্রতিশোধকে ভয় করবে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা শুনেও এমনি ধরনের চিন্তা করবে। কোরআনে বর্ণিত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিগোচর হলে সে সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করবে। কেননা, কোরআন থেকে যেসব তত্ত্ব বুঝা যায়, সেগুলো পুরোপুরি লেখা সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ, আর্দ্র ও শুষ্ক সকলই প্রকাশ্য কিতাবে রয়েছে।

অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, যদি সমুদ্র কালি হয়ে হয়ে যায় আমার পালনকর্তার বাণীসমূহ লেখার জন্যে, তবে বাণী শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমি এর অনুরূপ আরও কালি এনে নেই।

আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই। এদিক দিয়েই হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুর তফসীর দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করে দিতে পারি। এখানে আমরা যা উল্লোখ করেছি, তা কেবল পথ খুলে দেয়ার জন্যে করেছি। অন্যথায় এ বিষয়টি পুর্ণরূপে বর্ণনা করার আশাই করা যায় না। যে ব্যক্তি কোরআন মজীদের বিষয়বস্তু সামান্যও বুঝে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِىْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ, তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান পাতে। অবশেষে

যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে বলে ঃ এ মাত্র সে কি বলল? এদের অন্তরেই আল্লাহ্ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন।

ষষ্ঠতঃ কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে যেসকল বাধাবিপত্তি রয়েছে, সেগুলো থেকে একাগ্র চিত্ত হতে হবে। অধিকাংশ লোক যারা কেরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি, তাদের না বুঝার কারণ এটাই যে, শয়তান তাদের অন্তরের উপর বাধাবিপত্তির আবরণ রেখে দিয়েছে। ফলে কোরআনের বিস্ময়কর অর্থসম্ভার তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لو لا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا الى الملكوت ـ

অর্থাৎ, যদি শয়তানরা মানুষের অন্তরের উপর অবিরাম চক্কর দিতে না থাকত, তবে তারা ফেরেশতা জগতকেও দেখতে পেত।

যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত এবং যা বিবেকের নূর ছাড়া জানা যায় না, তাই ফেরেশতা জগতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের অর্থসম্ভারও এমনি।

কোরআন বুঝার পথে আবরণ চারটি। প্রথম, এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া যে, কোরআনের অক্ষরসমূহকে মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকেই উচ্চারণ করা উচিত। কারীদের উপর নিয়োজিত একটি শয়তান এ ব্যাপার তদারক করে থাকে– যাতে সে কারীদের প্রচেষ্টা কোরআনের অর্থ বুঝা থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে কারীদেরকে প্রত্যেকটি অক্ষর বার বার উচ্চারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে যে, অক্ষরটি এখনও সঠিক মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়নি। সুতরাং যে ক্ষেত্রে কারীদের প্রচেষ্টা ও চিন্তাভাবনা কেবল অক্ষরসমূহের মাখরাজেই সীমিত থেকে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কোরআনের অর্থ কিরূপে পরিস্ফুট হবে? যে ব্যক্তি শয়তানের এ ধরনের প্রতারণার শিকার

হয়, সে ক্ষেত্রবিশেষে শয়তানের একজন বড় ভাঁড়ে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে, কোন মতবাদ শুনে তার অনুসারী হয়ে যাওয়া এবং প্রশংসা করা। এরূপ ব্যক্তি তার বিশ্বাসের শিকলে আবদ্ধ থাকে। ফলে তার অন্তরে নিজের বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন কথা স্থান পায় না। তার দৃষ্টি কেবল নিজের শুনা কথার উপর নিবদ্ধ থাকে। যদি সে দূর থেকে কোন আলো দেখতে পায় এবং কিছু অর্থ তার বিশ্বাসের খেলাফ প্রকাশ পায়, তবে অনুসরণরূপী শয়তান তার উপর চড়াও হয়ে বলে ঃ এ কথা তোমার মনে কিরূপে এল? এটা তো তোমার বুযুর্গদের আকীদার খেলাফ। এর পর লোকটি এসব অর্থকে শয়তানের প্রবঞ্চনা মনে করে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। এ অর্থেই সুফী বুযুর্গগণ বলেন, জ্ঞান এক প্রকার আবরণ। এখানে জ্ঞান বলে তারা এমন আকায়েদের জ্ঞান বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ লোক কেবল অনুসরণের দিক থেকে অবলম্বন করে নেয়, অথবা মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা বিতর্কমূলক বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে শিখিয়ে দেয়। নতুবা সত্যিকার জ্ঞান হচ্ছে কাশফ ও অন্তর্দৃষ্টির নূর প্রত্যক্ষ করা। এটা কোনরূপেই আবরণ হতে পারে না, এরূপ জ্ঞানই চরম প্রার্থিত বিষয়।

তৃতীয় আবরণ হচ্ছে, কোন গোনাহে অব্যাহতভাবে লিপ্ত থাকা অথবা অহংকারী হওয়া অথবা পার্থিব বিষয়াদির মোহে পতিত হওয়া। এগুলোর কারণে অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং তাতে মরিচা পড়ে যায়। আয়নায় মরিচা পড়ে গেলে যেমন তাতে প্রতিচ্ছবি যথাযথ প্রতিফলিত হয় না, তেমনি এগুলো থাকলে অন্তরে সত্যের দ্যুতি পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠে না। অন্তরের উপর মোহ ও কামনার স্তূপ যত বেশী হবে ততই এর তরফ থেকে কোরআনের অর্থের উপর বেশী আবরণ পড়বে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বোঝা যত হালকা হবে, ততই অর্থের দ্যুতি নিকটে এসে যাবে। কেননা, যার প্রতিচ্ছবি আয়নার মত, মোহ মরিচার মত এবং কোরআনের অর্থ সেই চিত্রের মত যার প্রতিচ্ছবি আয়নায় প্রতিফলিত হয়। অন্তর থেকে মোহ দূর করা আয়না ঘষে মেজে পরিষ্কার করার অনুরূপ। এজন্যেই

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত যখন দীনার ও দেরহামকে বড় মনে করবে, তখন তার কাছ থেকে ইসলামের ভীতি দূর হয়ে যাবে। তারা যখন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন ওহীর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ এর অর্থ, তারা কোরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

চতুর্থ আবরণ হচ্ছে, বাহ্যতঃ কোন তফসীর পড়ে নিয়ে এরূপ বিশ্বাস করে নেয়া যে, হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ কোরআনের যে তফসীর বর্ণনা করছেন, তা ছাড়া কোরআনের অন্য কোন তফসীর নেই। কেউ অন্য অর্থ বললে সে তার বিবেক দ্বারাই তা বলে। এরূপ তফসীরকার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি নিজের মতামত দ্বারা কোরআনের তফসীর করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে নেয়। এরূপ বিশ্বাসও কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়।

চতুর্থ শিরোনামে আমরা বর্ণনা করব যে, মতামত দ্বারা তফসীর করার অর্থ কি?

সপ্তমতঃ কোরআনের প্রত্যেকটি সম্বোধন নিজের জন্যে মনে করবে। অর্থাৎ, কোন আদেশ নিষেধ শুনলে মনে করবে, এ আদেশ নিষেধ আমাকে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তি বাণী শুনলে তা নিজের জন্যে মনে করবে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরগণের কিস্সা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ থেকে শিক্ষা দান করা লক্ষ্য। কেননা, কোরআন পাকের সবগুলো কিস্সার বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্যে কিছু না কিছু উপকারী।

এজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে প্রতিষ্ঠা দান করি।

অতএব তেলাওয়াতকারীর মনে করে নেয়া উচিত, আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের অবস্থা তথা নির্যাতনের মুখে তাঁদের ধৈর্য এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার কাহিনী বর্ণনা

করে আমাদের অন্তরকে সত্যের উপর কায়েম রাখতে চান। আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যই কোরআন নাযিল করেননি; বরং কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রতিষেধক, হেদায়াত, নূর, রহমত। তাই আল্লাহ্ সকল মানুষকে কোরআনরূপী নেয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। আর স্মরণ কর তোমাদের উপদেশের জন্যে তোমাদের উপর যে কিতাব ও প্রজ্ঞা নাযিল হয়েছে তাকে?

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উপর এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশ। তোমরা কি বুঝ না?

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ـ

অর্থাৎ, এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের কাছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের

অনুসরণ কর।

আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ, এটা মানুষের জন্যে উপদেশ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ, এটা মানুষের জন্য বর্ণনা এবং খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

এসব আয়াত থেকে জানা গেল, সম্বোধন সকল মানুষকেই করা হয়েছে। তেলাওয়াতকারীও তাদের একজন বিধায় সেও নিঃসন্দেহে তাতে শরীক। তাই মনে করা উচিত, সম্বোধন দ্বারা সে-ই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

অর্থাৎ– আমার প্রতি এই কোরআন ওহীযোগে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এই কোরআন পৌঁছে, সতর্ক করি।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী বলেন ঃ যার কাছে কোরআন পৌঁছে, তার সাথে যেন আল্লাহ তাআলা কথা বলেন। তেলাওয়াতকারী যখন নিজেকে সম্বোধিত মনে করবে, তখন যেনতেনভাবে তেলাওয়াত করবে না; বরং এমনভাবে তেলাওয়াত করবে, যেমন গোলাম তার প্রভুর পরওয়ানা পাঠ করে, যাতে প্রভু লেখে, তাকে বুঝেসুজে কাজ করতে হবে। এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ঃ এই কোরআন আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে পত্র ও ওয়াদা-অঙ্গীকারসহ আগমন করেছে, যাতে এগুলো আমরা নামাযের মধ্যে বুঝি এবং একান্তে অবগত হয়ে আনুগত্যের কাজে বাস্তবায়ন করি। হযরত মালেক ইবনে দীনার বলতেন ঃ হে কোরআনধারীগণ, কোরআন তোমাদের অন্তরে কি বপন করেছে? কোরআন মুমিনের জন্যে বসন্তকাল, যেমন মাটির জন্যে বৃষ্টি

বসন্তকাল। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের সাহচর্য অবলম্বন করে, সে লাভবান হয়, না হয় লোকসান দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ . وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا .

অর্থাৎ, কোরআন মুমিনের জন্যে প্রতিষেধক ও রহমত এবং এটা গোনাহগারদের জন্যে কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

অষ্টম আদব এই যে, তেলাওয়াতের সময় যখন যে ধরনের বিষয়বস্তু আসবে, তখন সে ধরনের প্রভাব কবুল করবে। চিন্তা, ভয় ও আশার আয়াতসমূহ পাঠকালে, অন্তরে সে অবস্থাই সৃষ্টি করবে। যার অন্তরে আল্লাহর মারেফত কামেল হবে, তার অন্তরে অধিকাংশ সময় ভয় প্রবল থাকবে। কেননা, কোরআনের আয়াতসমূহে সংকোচন অনেক বেশী । উদাহরণতঃ রহমত ও মাগফেরাতের আলোচনা এমন সব শর্তের সাথে জড়িত দেখা যায়, যা অর্জন করতে সাধক অক্ষম হয়ে পড়ে। দেখ, মাগফেরাতের ক্ষেত্রে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى .

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি সে ব্যক্তির মাগাফেরাত করি, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে থাকে। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

অর্থাৎ, পড়ন্ত দিনের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

এতেও চারটি শর্ত উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে সংক্ষেপ করা হয়েছে সেখানেও এমনি একটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে, যাতে সবগুলো শর্ত দাখিল। উদাহরণতঃ বলা হয়েছে ঃ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সজ্জনদের নিকটবর্তী।

এখানে রহমতের জন্যে সজ্জন হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। সজ্জন হওয়ার জন্যে পূর্বোল্লিখিত সকল শর্তের উপস্থিতি দরকার। কোরআনের আদ্যোপান্ত পাঠ করলে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু অনেক পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, তার মধ্যে ভয় ও চিন্তা থাকাই যথার্থ। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যে কোরআন পাঠ করে ও তার প্রতি ঈমান রাখে, তার চিন্তা অনেক বেড়ে যায় এবং আনন্দ হ্রাস পায়। সে কাঁদে বেশী এবং হাসে কম। তার দুঃখ ও কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং আরাম ও কর্মহীনতা কমে যায়। ওহায়ব ইবনে ওয়ার্দ বলেন ঃ আমি হাদীস ও ওয়াযের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি; কিন্তু কোরআনের তেলাওয়াত ও চিন্তাভাবনা যত বেশী অন্তরকে নরম করে এবং চিন্তাকে টেনে আনে, তত বেশী আর কোন কিছুই পারে না। মোট কথা, তেলাওয়াত দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার গুণে গুণান্বিত হয়ে যাওয়া। উদাহরণতঃ শাস্তির আয়াতে এবং যে আয়াতে মাগফেরাতকে অনেক শর্তের সাথে জড়িত করা হয়েছে, সেখানে এতটুকু ভীত হবে যেন মরেই যাবে। আর যেখানে রহমত ও মাগফেরাতের ওয়াদা করা হয়েছে, সেখানে এমন খুশী হবে যেন খুশীতে উড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ও নাম বর্ণিত হওয়ার সময় তার প্রতাপের সামনে বিনম্র হওয়া ও তাঁর মাহাত্ম্য জানার কারণে মস্তক নত করে দেবে। যখন কাফেরদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের অসম্ভব উক্তি পাঠ করবে, যেমন আল্লাহ্ সন্তানধারী, তাঁর পত্নী আছে– তখন কণ্ঠস্বর নীচু করে দেবে এবং মনে মনে লজ্জিত হবে। জান্নাতের অবস্থা বর্ণিত হওয়ার সময় অন্তরে তাঁর প্রতি আগ্রহ জাগ্রত করবে এবং জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার সময় তার ভয়ে কেঁপে উঠবে। রসূলে করীম (সাঃ) একবার হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমাকে কোরআন পাঠ করে শুনাও। হযরত ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমি সূরা নিসা শুরু করে এই আয়াতে পৌঁছলাম–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا .

অর্থাৎ, তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী ডাকব এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর সাক্ষ্যদাতারূপে?

এ সময় দেখলাম, রসূলে করীম (সাঃ))-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ এখন বন্ধ কর। এটা বলার কারণ, এ অবস্থা প্রত্যক্ষকরণে তখন তাঁর অন্তর নিমজ্জিত ছিল। কেউ কেউ শাস্তির আয়াত শুনে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যেতেন। আবার কেউ কেউ এমনও ছিলেন যে, আয়াত শুনতে শুনতে তাদের আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গিয়েছিল। সারকথা, এ ধরনের প্রভাবের ফলে তেলাওয়াতকারী নিছক নকলকারী থাকে না। উদাহরণতঃ

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ -

অর্থাৎ, আমি পরওয়ারদেগারের অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের আযাবকে ভয় করি।

এ আয়াত পাঠ করার সময় যদি অন্তরে ভয় না থকে, তবে এটা কেবল কালাম নকল করা হবে।

অনুরূপভাবে– عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ, তোমার উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে।

এ আয়াত পাঠ করার সময় যদি ভরসা ও প্রত্যাবর্তনের অবস্থা না হয়, তবে এটা মৌখিক উদাহরণই হবে। এরূপ পাঠক নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহের প্রতীক হয়ে যাবে–

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ -

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক রয়েছে, যারা কিতাবের খবর রাখে না; কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। অর্থাৎ, কেবল তেলাওয়াতই জানে।

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ -

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কিছু নিদর্শনাবলী রয়েছে, যেগুলোর কাছ দিয়ে তারা পথ চলে এবং সেদিকে ধ্যান করে না।

কেননা, কোরআন পাকে এসব নিদর্শন উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে। পাঠক এগুলো এড়িয়ে গেলে এবং প্রভাবান্বিত না হলে বলতে হবে যে, সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের চরিত্রে ভূষিত হয় না, সে যখন কোরআন পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার কালামের সাথে তোর কি সম্পর্ক? তুই তো আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই নিয়েছিস। তুই যদি আমার দিকে প্রত্যাবর্তন না করিস, তবে আমার কালাম পাঠ করার প্রয়োজন নেই। পাপী ব্যক্তির বার বার কোরআন পাঠ করা এমন, যেমন কেউ রাজকীয় পরওয়ানা সারা দিনে কয়েকবার পাঠ করে এবং তাতে নির্দেশ থাকে, দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ কর; কিন্তু সে দেশকে উৎসন্ন করার কাজে লিপ্ত থাকে এবং পরওয়ানাটি কেবল পাঠ করেই ক্ষান্ত থাকে। সে যদি পরওয়ানা পাঠ না করত এবং রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করত, তবে এতে রাজকীয় পরওয়ানার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন এবং রাজকীয় ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা সম্ভবতঃ কম হত। এ কারণেই ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন ঃ আমি কোরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করি; কিন্তু যখন কোরআনের বিষয়বস্তু স্মরণ করি, তখন ভীত হয়ে পড়ি এবং তেলাওয়াত ছেড়ে তসবীহ ও এস্তেগফার পাঠ করতে শুরু করি। যে ব্যক্তি কোরআনের আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার কর্ম এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ -

অর্থাৎ, তারা তাকে পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং এর বদলে

তুচ্ছ বস্তু ক্রয় করল। তারা খুব মন্দ ক্রয় করে।

এ জন্যেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যতক্ষণ মনে চায় এবং মন নরম থাকে, ততক্ষণ কোরআন পাঠ কর। এ অবস্থা না থাকলে কোরআন পাঠ ক্ষান্ত কর। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত হয়, তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুনে যা মনে হয় সে আল্লাহকে ভয় করে, সেই সুকণ্ঠ কারী । তিনি আরও বলেন ঃ খোদাভীরুর মুখ থেকে কোরআন যেরূপ ভাল শুনা যায়, তেমন অন্য কারও মুখ থেকে শুনা যায় না। সুতরাং কোরআন পাঠের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অন্তরে এসব অবস্থা প্রকাশ পাওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা। নতুবা কেবল শব্দ উচ্চারণে জিহবা নাড়াচাড়া করলে লাভ কি? এজন্যেই জনৈক কারী বলেন ঃ আমি আমার ওস্তাদকে কোরআন পাঠ করে শুনালাম। এর পর পুনরায় শুনানোর জন্যে যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ আমার সামনে পাঠ করাকেই তুমি আমল মনে করে নিয়েছ। যাও, আল্লাহর সামনে পাঠ কর এবং দেখ তিনি কি নির্দেশ করেন এবং কি বুঝাতে চান। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম হাল ও আমল অর্জনে ব্যাপৃত থাকতেন। রসূলে করীম (সাঃ) এক লাখ বিশ হাজার সাহাবী রেখে ওফাত পান; কিন্তু তাঁদের মধ্যে সমগ্র কোরআনের হাফেয ছিলেন খুবই সীমিত সংখ্যক । অধিকাংশ সাহাবী একটি অথবা দু'টি সূরা হেফয করতেন। যাঁরা সূরা বাকারা ও সূরা আনআম হেফয করতেন, তাঁদেরকে আলেম বলে গণ্য করা হত। এক ব্যক্তি কোরআন শিখতে এসে যখন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ

অর্থাৎ, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

আয়াতে পৌছল, তখন একথা বলে চলে গেল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ লোকটি ফকীহ্ (আলেম) হয়ে ফিরে গেছে। বাস্তবে সে অবস্থাই প্রিয় ও দুর্লভ, যা আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারের অন্তরে আয়াত বুঝার পরে দান করেন। কেবল জিহবা নাড়াচাড়া করা তেমন উপকারী নয়; বরং যে ব্যক্তি মুখে তেলাওয়াত করে এবং আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে এই আয়াতের প্রতীক হওয়ার যোগ্য–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ـ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ـ

অর্থাৎ, যে আমার কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্যে রয়েছে সংকীর্ণ জীবিকা। আমি কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশরে সমবেত করব। সে বলবে ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করলে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ আগমন করেছিল; তুমি সেগুলো বিস্মৃত হয়েছিলে। আজ তুমিও তদ্রূপ বিস্মৃত হবে।

অর্থাৎ, তুমি আয়াতসমূহ চিন্তাভাবনা ছাড়াই পরিত্যাগ করেছিলে এবং কোন পরওয়া করনি।

বলাবাহুল্য, যে তেলাওয়াতে জিহবা, বোধশক্তি ও অন্তর শরীক থাকে, তাকেই যথার্থ তেলাওয়াত বলা হয়। জিহবার কাজ অক্ষর শুদ্ধ করে পড়া। বোধশক্তির কাজ অর্থ বর্ণনা করা এবং অন্তরের কাজ হচ্ছে

আদেশ পালন করা ও প্রভাবান্বিত হওয়া। সুতরাং জিহবা যেন উপদেশদাতা, বোধশক্তি যেন ভাষ্যকার এবং অন্তর যেন উপদেশ গ্রহিতা।

নবম আদব হচ্ছে, তেলাওয়াতে এতটুকু উন্নতি করা যাতে মনে হয় কোরআন আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে শুনছে, নিজের কাছ থেকে নয়। কেননা, তেলাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী নিজেকে ধরে নেবে যেন সে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করছে, আল্লাহ তার দিকে দেখছেন এবং তেলাওয়াত শুনছেন। এ স্তরে তেলাওয়াতকারীর মধ্যে প্রার্থনা, খোশামোদ, নম্রতা ও অক্ষমতার অবস্থা প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, সে নিজের অন্তর দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেখছেন, স্বীয় কৃপায় তাকে সম্বোধন করেন এবং অনুগ্রহবশতঃ তার কাছে গোপন রহস্যের কথা বলেন। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকারী লজ্জা, সম্মান প্রদর্শন, শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে অবস্থান করবে।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে, তেলাওয়াতকারী কালামের ভেতরে এ কালাম যাঁর সেই আল্লাহকে দেখবে এবং শব্দের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ, নিজেকে দেখবে না, নিজের কেরাআতের প্রতি লক্ষ্য করবে না এবং নিজের উপর নেয়ামত সম্পর্কেও ধ্যান করবে না; বরং সমগ্র শক্তি ও চিন্তা আল্লাহর রহমতে সীমিত ও নিবদ্ধ করে দেবে। এটা নৈকট্যশীলদের স্তর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীনের স্তর। যে কেরাআত এই তিন স্তরের বাইরে থাকে, সেটা গাফেলদের কেরাআত। ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) তৃতীয় স্তর এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে সৃষ্টির জন্যে আপন দ্যুতি বিকিরণ করেছেন। কিন্তু সৃষ্টি তা দেখে না। একবার তিনি নামাযে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে কেউ তাঁকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আমি আয়াতটি বার বার মনে মনে পাঠ করছিলাম। অবশেষে আমি তা মুতাকাল্লিম আল্লাহর কাছ থেকে শুনলাম। ফলে তাঁর কুদরত দেখার জন্যে আমার দেহ স্থির রইল না। এ স্তরে

মিষ্টতা এবং মোনাজাতের আনন্দ অত্যধিক অর্জিত হয়। এ কারণেই জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ আমি কোরআন পাঠ করতাম, কিন্তু তার মিষ্টতা অনুভব করতাম না। অবশেষে এভাবে পাঠ করলাম যেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনছি। তিনি তাঁর সহচরগণকে শুনাচ্ছেন। এর পর আর এক স্তর উপরে ওঠে এভাবে পাঠ করলাম যেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শিক্ষা দিচ্ছেন আর আমি শুনছি। এর পর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আরও একটি স্তর দান করলেন। এখন আমি কোরআন মুতাকাল্লিম আল্লাহ্র কাছ থেকে শুনি এবং এমন মিষ্টতা ও আনন্দ অনুভব করি, যাতে সবর করা যায় না। হযরত ওসমান ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ অন্তর পবিত্র হয়ে গেলে কোরআন তেলাওয়াত করে তৃপ্ত হওয়া যায় না। এটা বলার কারণ, পবিত্রতার ফলে কালামে মুতাকাল্লিমকে প্রত্যক্ষ করার দিকে অন্তর উন্নতি লাভ করে। এ কারণেই সাবেত বানানী বলেন ঃ বিশ বছর তো আমি কোরআনে কেবল শ্রমই স্বীকার করেছি; কিন্তু বিশ বছর তা থেকে মিষ্টতাও পেয়েছি। তেলাওয়াতকারী যদি মুতাকাল্লিমকেই প্রত্যক্ষ করে এবং অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তবে আল্লাহ্ তাআলার এসব আদেশ পালনকারী হবে– فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।

لَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করো না।

সারকথা, যে ব্যক্তি প্রত্যেক কাজে আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে। যে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী হবে, তার দৃষ্টিপাতে কিছুটা গোপন শেরক থাকবে। অথচ খাঁটি তওহীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য না করা।

দশম আদব, আপন শক্তি ও বল ভরসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। উদাহরণতঃ যখন সৎকর্মপরায়ণদের প্রশংসা ও ওয়াদার আয়াত পাঠ করবে, তখন নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা

করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে তাকেও শামিল করুন। পক্ষান্তরে যখন গজব ও ক্রোধের আয়াত এবং গোনাহগারদের নিন্দা পাঠ করবে, তখন নিজেকে দেখবে এবং ধরে নেবে, এই সম্বোধন তাকেই করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে। এ কারণেই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) দোয়া করতেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার কাছে জুলুম ও কুফর থেকে মাগফেরাত চাই। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ জুলুম তো বুঝা যায়; কিন্তু আপনি কুফর থেকে মাগফেরাত চান কিরূপে? তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ বড় জালেম ও অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, এই কুফর (অকৃতজ্ঞতা) থেকে মাগফেরাত চাই। এটা মানুষের জন্যে আয়াতদৃষ্টে নিশ্চতরূপে প্রমাণিত। ইউসুফ ইবনে আসবাতকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন কি দোয়া করেন? তিনি বললেন ঃ দোয়া কি করব, আপন গোনাহের মাগফেরাত সত্তর বার চাই। মোট কথা, কোরআন তেলাওয়াতে নিজেকে গোনাহের কাঠগড়ায় দেখলে এটা তার নৈকট্য লাভের কারণ হয়। এই ভয় তাকে নৈকট্যের এক স্তরে পৌঁছে দেয়। এ স্তর প্রথম স্তর থেকে উত্তম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দূরে থেকে নৈকট্য প্রত্যক্ষ করে, তাকে ভয়হীনতা দান করা হয়, যা পরিণামে তাকে প্রথম স্তরের দূরত্ব থেকে আরও দূরে পৌঁছিয়ে দেয়। হাঁ, তেলাওয়াতকারী যদি নিজের দিকে ভ্রুক্ষেপই না করে এবং তেলাওয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ না করে, তবে তার সামনে ঊর্ধ্ব জগতের রহস্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সোলায়মান ইবনে আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সাধক ইবনে সওবান একদিন তাঁর ভাইকে বললেন ঃ আমি তোমার কাছে ইফতার করব। এর পর তিনি সকাল পর্যন্ত সেখানে যেতে পারেননি। পরদিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে ভাই বলল ঃ আপনি আমার কাছে ইফতার করার ওয়াদা করে এলেন না, ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ আমি তোমার সাথে ওয়াদা না করলে যে কারণে আসতে পারিনি তা বলতাম না। ব্যাপার এই যে, আমি এশার নামায় শেষে মনে মনে ভাবলাম, তোমার কাছে যাওয়ার পূর্বে বেতেরও পড়ে নেই। কারণ, এর মধ্যে মৃত্যু এসে গেলে বেতের পড়ার সুযোগ হবে না। যখন আমি বেতেরের দোয়া পড়তে লাগলাম, তখন আমার সামনে একটি বাগিচা পেশ করা হল। এতে জান্নাতের বিভিন্ন ফুল শোভা পাচ্ছিল। আমি তন্ময় হয়ে সকাল পর্যন্ত ফুলগুলো দেখলাম। এ কারণে তোমার কাছে যাওয়ার সময় পাইনি। এ ধরনের কাশফ তখন হয়, যখন মানুষ নিজ থেকে, নিজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা থেকে এবং কামনা-বাসনার ধ্যান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। এ কাশফ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তন্ময়তা অনুযায়ী বিশেষ রূপ ধারণ করে। উদাহরণতঃ যখন আশার আয়াত পাঠ করে এবং তার তন্ময়তার উপর সুসংবাদ প্রবল হয়, তখন তার সামনে জান্নাতের চিত্র ভেসে উঠে। সে তাও এমনভাবে দেখে, যেন চর্মচক্ষে বাহ্যতঃ দেখে যাচ্ছে। আর যদি তন্ময়তার উপর ভয় প্রবল হয়, তবে জাহান্নাম দৃষ্টিতে ভেসে উঠে এবং সে জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। এর কারণ, কোরআন মজীদে নরম-গরম, কোমল কঠোর, আশাব্যঞ্জক, ভীতিপ্রদ ইত্যাদি সকল প্রকার কালাম রয়েছে। মুতাকাল্লিম আল্লাহর গুণাবলী যেমন বহুবিধ, তেমনি তাঁর কালামের বিষয়বস্তুও বহুবিধ। আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে রহমত, কৃপা, প্রতিশোধ, পাকড়াও ইত্যাদি। তাঁর এসব গুণই তাঁর কালামে পাওয়া যায়। সুতরাং যে ধরনের কালাম প্রত্যক্ষ করবে, অন্তরের হালও তেমনি বদলে যাবে। কেননা, এটা অসম্ভব যে, কালাম বদলে যাবে আর শ্রোতার হাল অপরিবর্তিত থাকবে।

বিবেকের সাহায্যে কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গ

সুফী বুযুর্গগণ তাসাওউফের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের কোন কোন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করে থাকেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ থেকে বর্ণিত নয়। যারা কোরআনের বাহ্যিক তফসীর পাঠ করে এবং জানে, তারা এ ব্যাপারে সুফীগণের প্রতি কেবল

দোষারোপই করে না; বরং তাদের এ ব্যাখ্যাকে কুফর পর্যন্ত বলে থাকে। কেননা, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من فسر القران برايه فليتبوأ مقعده من النار -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপন মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসীর করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

দোষারোপকারীদের এ বক্তব্য সঠিক হলে কোরআন বুঝার অর্থ এছাড়া আর কিছুই থাকে না যে, বর্ণিত তফসীরসমূহ মুখস্থ করে নিতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের বক্তব্য সঠিক না হলে উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য কি, তা আলোচনা করতে হবে।

যারা বলে, কোরআনের অর্থ তাই, যা বাহ্যিক তফসীরে বর্ণিত রয়েছে, তারা নিজেদের বিদ্যার চরম সীমারই খবর দেয়। নিজেদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তারা ঠিক কথাই বলে; কিন্তু অন্যদেরকে যে তারা নিজেদের স্তরে টেনে আনতে চায়, এ ব্যাপারে তারা ভ্রান্ত। কেননা, হাদীস ও মনীষীগণের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে অবকাশ রয়েছে। সেমতে হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তাঁর কালামের বোধশক্তি দান করেন। বর্ণিত অনুবাদ ছাড়া কোরআনের যদি অন্য কোন অর্থ না হয়, তবে এই বোধশক্তির উদ্দেশ্য কি? রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কোরআনের একটি বাহ্যিক এবং একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। আর আছে একটি সীমা ও একটি উদয়াচল। এ রেওয়ায়েতটি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকেও তাঁরই উক্তি হিসেবে বর্ণিত আছে। তিনি ছিলেন তফসীরবিদ সাহাবীগণের অন্যতম। সুতরাং বাহ্যিক অর্থ, অভ্যন্তরীণ অর্থ, সীমা ও উদয়াচল– এ সবের কি অর্থ?

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে আলহামদুর তফসীর দ্বারা সত্তরটি উট বোঝাই করতে পারি। এ উক্তির অর্থ কি? আলহামদুর বর্ণিত ও বাহ্যিক তফসীর তো খুবই সামান্য। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ যে পর্যন্ত ফকীহ হয় না, এ পর্যন্ত সে কোরআনকে কয়েক

ভাগে ভাগ না করে নেয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ প্রত্যেক আয়াতের ষাট হাজার অর্থ আছে এবং যেসব অর্থ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, সেগুলো আরও বেশী। অন্য একজন বলেন ঃ কোরআন সত্তর হাজার দু'শ বিদ্যা পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। কেননা, প্রত্যেক কলেমার জন্যে একটি বিদ্যা রয়েছে। প্রত্যেকেরই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থ এবং সীমা ও উদয়াচল রয়েছে বিধায় অর্থ চতুর্গুণ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে পুনঃ পুনঃ বিশ বার আবৃত্তি করেন। অর্থ বুঝার জন্যেই এরূপ করেছেন। নতুবা এর অনুবাদ ও তফসীর তো স্পষ্টই ছিল। এর পুনরাবৃত্তির কি প্রয়োজন ছিল? হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ কেউ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সে কোরআন নিয়ে আলোচনা করুক। এটাও কেবল বাহ্যিক তফসীর দ্বারা অর্জিত হয় না।

সারকথা, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলীর মধ্যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোরআনে তাঁর সত্তা, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন শেষ নেই। কোরআনে এগুলোর প্রতি সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এগুলোর বিশদ বিবরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা কোরআন বুঝার উপর নির্ভরশীল। কেবল বাহ্যিক তফসীর দ্বারা বিশদ বিবরণের ঈঙ্গিত জানা যায় না। যে সকল প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিষয়ে মানুষের মতভেদ রয়েছে, কোরআন মজীদে সেগুলোর প্রতি ইশারা ঈঙ্গিত আছে। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া এসব ঈঙ্গিত কেউ জানতে পারে না। এমতাবস্থায় বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ ও তফসীর এসব ইঙ্গিত বুঝার জন্যে কিরূপে যথেষ্ট হতে পারে? এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اقرءوا القران والتمسوا غرائبه -

অর্থাৎ, তোমরা কোরআন পাঠ কর এবং তার রহস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্বেষণ কর। হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমার উম্মত তার মূল ধর্ম পরিত্যাগ করে বাহাত্তর দলে বিভক্ত

হয়ে পড়বে। সকল দলই পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী হবে এবং জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দেবে। এ পরিস্থিতি দেখা দিলে তোমরা কোরআন মজীদকে আঁকড়ে থাকবে। কারণ, এতে তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের অবস্থাও স্থান পেয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান বিধানও এতে বিদ্যমান। প্রতাপশালীদের মধ্য থেকে যে এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে চুরমার করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোরআন ছাড়া অন্য কিছুতে জ্ঞান অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। কোরআন আল্লাহর মজবুত রশি, সুস্পষ্ট নূর এবং মহোপকারী প্রতিষেধক। যে একে ধারণ করে, সে সুরক্ষিত থাকে। যে এর অনুসরণ করে, সে মুক্তি পায়। এর রহস্যমন্ডিত বিষয়সমূহ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না এবং অনেক পাঠ করার কারণে পুরাতনও হয় না। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নযোগে আমাকে উম্মতের বিভেদ ও অনৈক্যের সংবাদ দিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি যদি সে যুগ পাই, তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কালাম শেখবে এবং তাতে যা কিছু আছে তা মেনে চলবে। মুক্তির উপায় এটাই। আমি তিন বার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি একই জওয়াব দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন বুঝে নেয়, সে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্ণনা করে। এতে তিনি এদিকেই ইশারা করেছেন যে, কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঈঙ্গিত বহন করে। হযরত ইবনে আব্বাস وَمَنْ يُّؤْتَي الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا (যাকে হেকমত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।) -এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হেকমতের অর্থ কোরআন বুঝার শক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا .

অর্থাৎ, অতঃপর আমি ফয়সালাটির বোধশক্তি দান করলাম সোলায়মানকে। আর প্রত্যেককেই আমি দিয়েছি সাম্রাজ্য ও জ্ঞান। এ আয়াতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান উভয়কে যা দান করা হয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছে জ্ঞান ও সাম্রাজ্য। আর হযরত সোলায়মানকে বিশেষভাবে যা দেয়া হয়েছিল তার নাম বোধশক্তি রাখা হয়েছে এবং তা অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। এসব বিষয় থেকে জানা যায়, কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে অনেক অবকাশ আছে। বর্ণিত বাহ্যিক তফসীর কোরআনের বিষয়বস্তুসমূহের চূড়ান্ত সীমা নয় যে, একে অতিক্রম করা যাবে না। কিন্তু এটাও ঠিক, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্বোক্ত হাদীসে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কোরআনের তফসীর করতে নিষেধ করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি কোরআন সম্পর্কে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কিছু বলি, তবে কোন্ ভূপৃষ্ঠ আমাকে বহন করবে এবং কোন্ আকাশ আমাকে লুকাবে? এছাড়া আরও যে সকল রেওয়ায়েতে এই নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য তফসীরের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরফ থেকে বর্ণনা ও শুনা যথেষ্ট মনে করা উচিত এবং নিজের মতামত ও বিবেক দ্বারা পৃথক অর্থ বুঝা অনুচিত। এছাড়া নিষেধাজ্ঞার অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে শ্রুত বিষয়াদি ছাড়া কেউ অন্য কিছু বলতে পারবে না - এরূপ উদ্দেশ্য হওয়া কয়েক কারণে অকাট্যরূপে বাতিল ।

প্রথম কারণ, শুনার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনতে হবে অথবা তফসীরটি তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হতে হবে। অথচ এটা কোরআনের সামান্য অংশের তফসীরেই পাওয়া যায়। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, যে তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বলেন, তা অগ্রাহ্য হবে এবং তাকেও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তফসীর আখ্যা দেয়া হবে। কেননা, তাঁরা এই তফসীর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেননি। অন্য সাহাবীগণের তফসীরের অবস্থাও একই রূপ হবে।

দ্বিতীয় কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তফসীরবিদগণ কোন কোন আয়াতের তফসীরে মতভেদ করেছেন। তাঁদের এসব বিভিন্নমুখী উক্তির

সমন্বয় সাধন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এগুলো সব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনা অসম্ভব। এ থেকে অকাট্যরূপে জানা যায় যে, প্রত্যেক তফসীরবিদ সেই অর্থই বলেছেন, যা তিনি ইজতিহাদ দ্বারা বুঝতে পেরেছেন। সূরাসমূহের শুরুতে উল্লিখিত খন্ড অক্ষরসমূহের ব্যাপারে সাতটি বিভিন্নমুখী উক্তি বর্ণিত আছে। উদাহরণতঃ আলিফ-লাম-মীম সম্পর্কে কেউ বলেন, এগুলো আর-রহমানের অক্ষর। কেউ বলেন ঃ আলিফ অর্থ আল্লাহ্, লাম অর্থ লতীফ (কৃপাকারী) এবং মীম অর্থ রহীম (দয়ালু)। কেউ অন্য কথা বলেন। এগুলো এক অর্থে একত্রিত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সবগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত কিরূপে হতে পারে?

তৃতীয় কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়ায় বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে বোধশক্তি দান কর এবং কোরআনের তফসীর শিক্ষা দাও।

সুতরাং কোরআনের ন্যায় তফসীরও যদি শ্রুত ও সংরক্ষিত হয়, তবে এর জন্যে হযরত ইবনে আব্বাসকে নির্দিষ্ট করার কি অর্থ হবে?

চতুর্থ কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِىْ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ এ আয়াতে আলেমদের জন্যে اِسْتِنْبَاط (উদ্ভাবন)-এর কথা প্রমাণিত আছে, যার অর্থ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোন কিছু জানা। বলাবাহুল্য, এটা শ্রুত বিষয় নয় – ভিন্ন কিছু। উপরোক্ত সবগুলো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কেবল শ্রুত বিষয় দ্বারা কোরআনের তফসীর করার ধারণা বাতিল; বরং কোরআন থেকে স্ব স্ব বোধশক্তি ও বিবেক অনুযায়ী বিষয়াদি চয়ন করা প্রত্যেক আলেমের জন্যে জায়েয। তবে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা দুই অর্থে ধরে নেয়া যায়। প্রথম– কোন বিষয়ে কারও কোন মতামত থাকে এবং সেদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা রাখে। এর পর এই মতামত সঠিক

সাব্যস্ত করার জন্যে আপন মতামত ও খাহেশ অনুযায়ী কোরআনের অর্থ বর্ণনা করে। যদি তার এই মতামত না থাকত, তবে কোরআন থেকে এই অর্থ সে জানত না। এটা কখনও সজ্ঞানে হয়, যেমন কেউ কোন একটা বেদআতকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্যে, কোরআনের কোন কোন আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করে। অথচ সে জানে আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। কিন্তু সে তার প্রতিপক্ষকে ধোকা দেয়। কখনও সে জানে না, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। কিন্তু আয়াতটি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে বিধায় যে অর্থ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে, সেদিকেই তার মতামত গড়ে উঠে এবং সে সেদিককেই অগ্রাধিকার দান করে। এ ধরনের তফসীরের প্রেরণাদাতা মতামতই হয়ে থাকে। মতামত না থাকলে এ তফসীরও তার মতে প্রবল হত না। কখনও মানুষের একটি বিশুদ্ধ মতলব থাকে এবং তার জন্যে কোরআন থেকে প্রমাণ তালাশ করে। অতঃপর সে এমন আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যার সম্পর্কে জানে, এই আয়াতের এই উদ্দেশ্য নয়। উদাহরণতঃ কেউ রাতের শেষ প্রহরে এস্তেগফার করার সপক্ষে এ হাদীসটি পেশ করে ঃ

تسحروا فان فى السحور بركة -

অর্থাৎ, তোমরা সেহরী কর। সেহরী করার মধ্যে বরকত আছে। সে বলে ঃ

এখানে সেহরী করার অর্থ রাতের শেষ প্রহরে যিকির করা। অথচ সে জানে, এর উদ্দেশ্য রোযার জন্যে সেহরী খাওয়া। অথবা কেউ কোন কঠোরপ্রাণ ব্যক্তিকে সাধনা করার নির্দেশ দিয়ে এ আয়াতটি প্রমাণস্বরূপ পেশ করা اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (ফেরাউনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে।) অতঃপর সে বলে, আয়াতে ফেরাউন বলে অন্তর বুঝানো হয়েছে। এটাও মতামতের ভিত্তিতে তফসীর। এ ধরনের তফসীর কোন কোন ওয়ায়েয তাদের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে যদিও তাদের নিয়ত সঠিক, তবুও এ ধরনের তফসীর নিষিদ্ধ। ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনও খারাপ উদ্দেশে মানুষকে

ধোকা দেয়ার জন্যে এবং নিজের মাযহাবে দাখিল করার উদ্দেশে এ ধরনের তফসীরকে কাজে লাগায় এবং কোরআনের অর্থ নিজস্ব মত অনুযায়ী বলে দেয়। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে জানে আয়াতের প্রকৃত অর্থ এটা নয়। মোট কথা, অশুদ্ধ ও মনের খেয়াল-খুশীর অনুগামী মতামতের ভিত্তিতে তফসীর করা নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ ইজতিহাদের মাধ্যমে তফসীর করলে তা নিষিদ্ধ তফসীরের আওতাভুক্ত হবে না। রায় তথা মতামত শব্দটি যদিও শুদ্ধ অশুদ্ধ উভয় প্রকার মতামত বোঝায়, কিন্তু কোন সময় রায় বিশেষভাবে সেই মতামতকেই বলা হয়, যা খেয়াল-খুশীর অনুগামী।

বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয় অর্থ এই ধরে নেয়া যায় যে, অনেকেই আরবী শব্দাবলী সম্পর্কে বাহ্যিক ধারণা নিয়েই কোরআনের তফসীর করতে প্রবৃত্ত হয়। এতে শ্রুত কোন কিছু থাকে না। তারা কোরআনের অপ্রচলিত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে না এবং অস্পষ্ট ও পরিবর্তিত শব্দ সম্পর্কেও তারা বিশেষজ্ঞ নয়। কোরআনের সংক্ষেপকরণ পদ্ধতি, উহ্যকরণ নীতি এবং অগ্রে ও পশ্চাতে উল্লেখকরণ নীতিরও কোন খবর তারা রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে ওয়াকিফহাল নয় এবং কেবল আরবী বুঝা সম্বল করেই কোরআনের অর্থ চয়নে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চিতরূপেই অনেক ভুল করবে এবং খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে তফসীরকারদের দলভুক্ত হবে। কেননা, বাহ্যিক অর্থ বুঝার জন্যে প্রথমে বর্ণনা ও শ্রবণ দরকার। বাহ্যিক তফসীরে পাকাপোক্ত হওয়ার পর অবশ্য বোধশক্তি ও চয়ন শক্তি বেড়ে যায়।

যে সকল অপ্রচলিত শব্দ আরবদের কাছে শুনা ছাড়া বুঝা যায় না, সেগুলো বহু প্রকার। নিম্নে আমরা কয়েক প্রকারের দিকে ইশারা করে দিচ্ছি, যাতে এগুলোর মাধ্যমে অন্যগুলোর অবস্থাও পরিস্ফুট হয় এবং এ কথাও জানা যায় যে, শুরুতে বাহ্যিক তফসীর আয়ত্ত ও পাকাপোক্ত করা ছাড়া কোরআনের অভ্যন্তরীণ রহস্য পর্যন্ত পৌঁছার আশা দুরাশা মাত্র। যে ব্যক্তি বাহ্যিক তফসীরে পাকাপোক্ত হওয়া ছাড়াই কোরআনী রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার দাবী করে, সে সে ব্যক্তির মত, যে দরজায় পা না রেখেই

গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার দাবী করে। কেননা, বাহ্যিক তফসীর অভিধান শিক্ষা করার স্থলবর্তী, যা বুঝার জন্যে অত্যাবশ্যক।

যে সকল বিষয় সম্পর্কে আরবদের কাছে শুনা জরুরী, সেগুলো অনেক। প্রথম উহ্যকরণ প্রক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত করা। যেমন, وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا এর অর্থ হচ্ছে, আমি চোখ খুলে দেয়ার জন্যে সামুদ সম্প্রদায়কে একটি উষ্ট্রী দিলাম। তারা তাকে হত্যা করে নিজেদের উপর জুলুম করল। এখানে বাহ্যিক শব্দাবলী দেখে পাঠক ধারণা করবে, উষ্ট্রীটি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিল, অন্ধ ছিল না। তারা কি কি জুলুম করল, নিজেদের উপর, না অন্যের উপর – পাঠক তাও জানবে না।

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ এ আয়াতে حب (মহব্বত) শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, গোবৎসের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর সিক্ত করে দেয়া হয়েছিল। اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ – এ আয়াতের উদ্দেশ্য, আমি তোমাকে জীবিতদের আযাবের দ্বিগুণ এবং মৃতদের আযাবের দ্বিগুণ আস্বাদন করাব। এখানে عذاب শব্দটি উহ্য রয়েছে এবং জীবিত ও মৃতদের স্থলে حيوة ও ممات শব্দদ্বয় বলা হয়েছে। আভিধানিক অলংকারে এই উহ্যকরণ ও পরিবর্তন সিদ্ধ। وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا এ বাক্যে اهل শব্দটি উহ্য আছে। অর্থাৎ, জিজ্ঞেস কর সেই গ্রামের অধিবাসীদেরকে, যেখানে আমরা ছিলাম।

ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –এখানে ثقلت শব্দের অর্থ গোপন হওয়া। অর্থাৎ কেয়ামত আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের কাছে গোপন। কোন বস্তু গোপন থাকলে তা ভারী হয়ে যায়। তাই শব্দের পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং اهل শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ এখানে شكر শব্দটি উহ্য । অর্থাৎ তোমাদেরকে রুজি দেয়ার

শোকর এই কর যে, তোমরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর। وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ এখানে السنة শব্দটি উহ্য। অর্থাৎ, আমাদেরকে দাও যার ওয়াদা তুমি রসূলগণের বাচনিক করেছ। اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এখানে নামপুরুষের সর্বনামটি কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অথচ তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়নি। حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এতে সর্বনামটি شمس -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۤءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى এখানে يقولون শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে ঃ আমরা এ জন্যেই তাদের পূজা করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে দেয়।

দ্বিতীয়, পরিবর্তিত শব্দ বর্ণিত হওয়া। যেমন وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ শব্দে سينا -এর পরিবর্তে سنين বর্ণিত হয়েছে এবং سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ তে الياس-এর স্থলে الياسين বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়, কালাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা, যা বাহ্যতঃ কালামের সংলগ্নতা ছিন্ন করে। যেমন–

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۤءَ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ ـ

এখানে ان يتبعون পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শরীকদের এবাদত করে, তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে।

চতুর্থ, শব্দের অগ্র পশ্চাৎ হওয়া। এরূপ স্থলে মানুষ সাধারণতঃ ভুল করে বসে। যেমন-

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى -এটা

এভাবে বুঝতে হবে وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى لَّكَانَ لِزَامًا এরূপ না হলে اجل শব্দটিতে যবর হওয়া উচিত যেমন- لزاما তে হয়েছে।

পঞ্চম, শব্দ অস্পষ্ট হওয়া, যা অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–امة روح - شئ - قرين ইত্যাদি শব্দ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ এখানে এর অর্থ ভরণ-পোষণে ব্যয় করা।

অন্যত্র বলা হয়েছে– وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ এখানে شئ এর অর্থ ন্যায় ও সততার আদেশ করা।

فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَيْءٍ –এখানে شئ বলে পালন কর্তৃত্বর গুণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যোগ্যতা সৃষ্টির আগে যা জিজ্ঞেস করা সাধকের জন্যে বৈধ নয়।

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ এখানে شئ এর অর্থ সৃষ্টিকর্তা।

এখন قرين শব্দের বিভিন্ন অর্থ দেখা যাক। আল্লাহ বলেন ঃ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ -এখানে قرين -এর অর্থ নিয়োজিত ফেরেশতা।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ -এখানে قرين বলে শয়তান বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে -امة শব্দটি আরবীতে আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

এক ঃ দল অর্থে, যেমন– وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ সেখানে একদল লোককে পেল, যারা পানি পান করাচ্ছিল।

দুই ঃ পয়গম্বরের অনুসারী অর্থে, যেমন আমরা বলি- আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত।

তিন ঃ সৎ ও ধর্মীয় নেতা অর্থে, যেমন- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন ধর্মীয় নেতা, আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও একাগ্র চিত্তে।

চার ঃ ধর্ম অর্থে, যেমন- إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ-আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক ধর্মের উপর পেয়েছি।

পাঁচ ঃ সময় কাল অর্থে, যেমন- إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

ছয় ঃ দৈহিক গড়ন অর্থে, যেমন বলা হয় فلان حسن الامة অমুক ব্যক্তির দৈহি গড়ন সুন্দর।

সাত ঃ একক ও অনন্য ব্যক্তি অর্থে, যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েলকে সৈন্যদের সাথে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন ঃ امة وحدة অর্থাৎ, সে উম্মতের অনন্য ব্যক্তি।

আট ঃ মা অর্থে, যেমন বলা হয় هذه امة زيد সে যায়েদের মা।

ষষ্ঠ ঃ ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করা। উদাহণতঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. রমযান মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রাতের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে, না দিনের বেলায়- তা প্রকাশ পায় না। এর পর বলা হয়েছে- إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ আমি এক মোবারক রাতে কোরআন নাযিল করেছি। এতে রাতে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু সেটা কোন্ রাত ছিল, তা জানা যায় না। ত্রপর বলা হয়েছে-

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ আমি কোরআন নাযিল করেছি শবে-কদরে। এতে সময়ের প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেল।

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়সমূহ এমন যে হাদীস ও রেওয়ায়েতের বর্ণনা এবং আরবদের কাছে শুনা ব্যতীত এগুলোর জন্যে অন্য কিছু যথেষ্ট হয় না। কোরআন মজীদ আদ্যোপান্ত এ ধরনের বিষয় বিবর্জিত নয়। কারণ, এটা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, তাই ايجاز (সংক্ষেপকরণ), تطويل (দীর্ঘকরণ), اضمار (সর্বনাম আনা), حذف (উহ্যকরণ), ابدال (পরিবর্তন করা), تقديم (অগ্রে আনা), تاخير (পশ্চাতে আনা) ইত্যাদি যত প্রক্রিয়া আরবী ভাষায় প্রচলিত ও ব্যবহৃত, সবগুলোই কোরআনে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক আরবী ভাষা বুঝেই কোরআনের তফসীর করতে প্রবৃত্ত হয় এবং শ্রবণ ও বর্ণনাকে কাজে না লাগায়, তবে সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তফসীর করে। হাদীসে এরূপ তফসীরই নিষিদ্ধ করা হয়েছে- কোরআনের অপার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা নিষিদ্ধ করা হয়নি। মোট কথা, বাহ্যিক তফসীর তথা শব্দাবলীর অনুবাদ জানা অর্থসম্ভারের স্বরূপ বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ এর বাহ্যিক অনুবাদ হচ্ছে, আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। এ অর্থের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কেননা, এতে নিক্ষেপ করা এবং না করার কথা একই সাথে বলা হয়েছে। বাহ্যতঃ এতে দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমাহার হয়েছে। তবে এটা বুঝে নিলে কোন অসুবিধা থাকে না যে, নিক্ষেপ করা এক দিক দিয়ে এবং নিক্ষেপ না করা অন্য দিক দিয়ে। যেদিক দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়নি, সে দিক দিয়ে আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। অনুরূপভাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে- قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ওদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ওদেরকে শাস্তি দেন। এতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে শাস্তিদাতা কিরূপে বুঝেন ? যদি বলা হয়- আল্লাহ্ তাআলাই যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের

হাতকে সক্রিয় করেন, তাই তিনি শাস্তিদাতা, তাহলে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ কি ? এসব অর্থের স্বরূপ এলমে মুকাশাফার এক অথৈ সমুদ্র মন্থন করেই জানা যায়– বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ এতে উপকারী নয়। এটা জানার জন্যে প্রথমে বুঝতে হবে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার কুদরত তথা সামর্থ্যের সাথে জড়িত। এ কুদরত আল্লাহ্ তাআলা কুদরতের সাথে সংযুক্ত। এমনি ধরনের অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়ার পর ফুটে ওঠবে যে, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ। ধরে নেয়া যাক, যদি এসব অর্থের রহস্য উদঘাটন এবং এর প্রাথমিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জানার কাজে কেউ সারা জীবন ব্যয় করে দেয়, তবে সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। কোরআন মজীদের এমন কোন কলেমা নেই, যার তথ্যানুসন্ধানে এধরনের বিষয়াদির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পাকাপোক্ত আলেমগণ এসব রহস্য সেই পরিমাণে জানতে পারেন, যে পরিমাণে তাদের এলমে আধিক্য, অন্তরে স্বচ্ছতা, আগ্রহে পর্যাপ্ততা এবং অন্বেষণে আন্তরিকতা থাকে। প্রত্যেকের জন্যে উন্নতির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কেউ এর উপরের সীমায়ও উন্নতি করতে পারে, কিন্তু সকল স্তর অতিক্রম করে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ ـ

অর্থাৎ, যদি সমুদ্র কালি হয় এবং সকল বৃক্ষ কলম হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্র কলেমাসমূহের রহস্য লেখে শেষ করা যাবে না। এ কারণেই রহস্য বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে থাকে, অথচ আয়াতের বাহ্যিক অনুবাদ ও তফসীর সকলেই জানে; কিন্তু বাহ্যিক তফসীর তাৎপর্য বুঝার জন্যে যথেষ্ট নয়।

নিম্নে তাৎপর্য বুঝার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে, যা জনৈক সাধক সেজদার অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি দোয়া থেকে বুঝতে

পেরেছেন। দোয়াটি এই ঃ

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

অর্থাৎ, আমি তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই তোমার ক্রোধ থেকে। আমি তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি থেকে। আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমা থেকে। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি এমন, যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ। অর্থাৎ, রসূলে করীম (সাঃ)-কে সেজদা দ্বারা নৈকট্য লাভ করার আদেশ করা হলে তিনি সেজদায় নৈকট্য লাভ করলেন। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে কতক গুণ দ্বারা কতক গুণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সেমতে সন্তুষ্টি গুণ দ্বারা ক্রোধ গুণ থেকে আশ্রয় চাইলেন এবং ক্ষমা গুণ দ্বারা শাস্তি প্রদানের গুণ থেকে আশ্রয় কামনা করলেন। এর পর তাঁর নৈকট্য আরও বেড়ে গেল এবং প্রথম নৈকট্য এরই মধ্যে একীভূত হয়ে গেল। তখন তিনি গুণাবলী থেকে সত্তায় উন্নীত হলেন এবং বললেন ঃ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমা থেকে । এর পর তাঁর নৈকট্য এত বৃদ্ধি পেল যে, তিনি এই ভেবে লজ্জিত হলেন, নৈকট্যের পর্যায় থেকে আশ্রয় চাই– এ কেমন কথা! তখনই তিনি তারীফ প্রশংসার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন ঃ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। এর পর তিনি প্রশংসাকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করাও ত্রুটি জ্ঞান করলেন এবং বললেন ঃ انت كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ তুমি এমন, যেমন তুমি নিজে নিজের প্রশংসা করেছ।

মোট কথা, সাধকের জন্যে এধরনের রহস্য উদঘাটিত হয়। এর পর এসব রহস্যের আরও অনেক স্তর আছে। অর্থাৎ নৈকট্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম

করা, বিশেষ নৈকট্য সেজদায় হওয়া, এক গুণ দ্বারা অন্য গুণ থেকে আশ্রয় চাওয়া, সত্তা থেকে সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি । এসব রহস্য বাহ্যিক শব্দের অনুবাদ দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু এগুলো বাহ্যিক অনুবাদের খেলাফও নয়, বরং এগুলো দ্বারা বাহ্যিক অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ ও মহিমান্বিত হয়। কোরআনের অভ্যন্তরীণ অর্থসম্ভার বুঝতে হবে– এ কথা বলার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্যও তাই যে, এসব অর্থসম্ভার বাহ্যিক অনুবাদের খেলাফ হবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ مُصْطَفٰى وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ

নবম অধ্যায়

যিকির ও দোয়া

কোরআন তেলাওয়াতের পরে আল্লাহ্ তায়ালার যিকির ও তাঁর দরবারে ব্যাকুল হৃদয়ে দোয়ার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য পেশ করার চাইতে উত্তম কোন মৌখিক এবাদত নেই বিধায় যিকির ও দোয়ার ফযীলত এবং এতদুভয়ের আদব ও শর্ত বর্ণনা করা জরুরী। নিম্নে পাঁচটি শিরোনামে আমরা এসব বিষয় বর্ননা করব।

যিকিরের ফযীলত

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।

সাবেত বানানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি জানি, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে কখন স্মরণ করেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এটা কিরূপে জানেন? তিনি বললেন ঃ আমি যখন তাঁকে স্মরণ করি, তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ তোমরা বেশী পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ কর।

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰاكُمْ ـ

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে তওয়াফের জন্যে রওয়ানা হও, তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে তাকে স্মরণ কর।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ـ

অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেমন তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাকে বরং আরও বেশী স্মরণ কর।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ۔

যারা স্মরণ করে আল্লাহকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বস্থিত অবস্থায়।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۔

অতঃপর নামাযান্তে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বস্থিত অবস্থায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাতে-দিনে, জলে স্থলে, বাড়ীতে-সফরে, সচ্ছলতায় নিঃস্বতায়, রুগ্নাবস্থায় সুস্থাবস্থায় এবং যাহেরে বাতেনে যিকির করতে থাক। মোনাফেকদের নিন্দা করে বলা হয়েছে "

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।

اُذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۔

তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাক মনে মনে, মিনতি সহকারে, ভয় সহকারে, জোরে কথা বলার চেয়ে কম শব্দে, সকাল ও সন্ধ্যায়। তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ-আল্লাহর যিকির সর্ববৃহৎ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর দু'অর্থ। এক, তোমরা আল্লাহকে যতই স্মরণ কর, তার চেয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করা নিঃসন্দেহে বড় কথা। দুই, আল্লাহ তা'আলার যিকির অন্য সকল এবাদতের তুলনায় বড়।

এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

০ গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী এমন, যেমন শুকনা ও ভাঙ্গা গাছপালার মাঝখানে কোন সবুজ বৃক্ষ থাকে।

ذكر الله فى الغافلين كالمقاتل فى الفارين যে গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকির করে, সে যেন পলায়নপর লোকদের মধ্যে যুদ্ধ করে।

ذكر الله فى الغافلين كالحى بين الاموات গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তির ন্যায়।

০ এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি বান্দার সাথে থাকি যে পর্যন্ত সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ঠোঁট নড়াচড়া করে।

০ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী আমলসমূহের মধ্যে যিকির অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ আমল নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর পথে জেহাদও নয়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জেহাদও নয়; কিন্তু যদি তরবারি দ্বারা মারতে মারতে তরবারি ভেঙ্গে ফেলে, আবার মারে ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে এবং আবার মারে ও তরবারি ভেঙ্গে ফেলে।

০ যে কেউ জান্নাতের পুষ্পোদ্যানে বিচরণ পছন্দ করে, তার বেশী করে যিকির করা উচিত।

০ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর যিকিরে রত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সর্বোত্তম আমল।

০ তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকরে রত থাক, যাতে এ সময় তোমাদের কোন গোনাহ না হয়।

০ সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা, আল্লাহর পথে

তরবারি ভেঙ্গে ফেলা এবং জলস্রোতের মত অর্থ দান করার চেয়েও উত্তম।

○ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন ঃ যখন বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। অর্থাৎ, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না। বান্দা যখন আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তাদের সে সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে আমার পানে আস্তে চললে আমি তার পানে দ্রুতবেগে চলি; অর্থাৎ তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল করি।

○ আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আপন আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ভয়ে কান্নাকাটি করে।

○ হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না, যা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম; তোমাদের কাছে অনেক পরিচ্ছন্ন, তোমাদের মর্তবাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ, তোমাদের জন্যে সোনারূপা দান করার চেয়েও ভাল এবং শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজে মরা এবং তাদেরকে মারার চেয়েও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, সে কথাটি কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করবে।

○ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাকে আমার যিকির আমার কাছে চাওয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে এমন বস্তু দেব, যা যারা চায়, তাদেরকে দেয়া বস্তু অপেক্ষা উত্তম হবে।

এ সম্পর্কে মহৎ ব্যক্তিগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

○ হযরত ফোযায়ল বলেন ঃ আমরা শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ হে ইবনে আদম! তুমি আমাকে এক ঘন্টা সকালে এবং

এক ঘন্টা আছরের পরে স্মরণ করে নিও। আমি এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তোমার জন্যে যথেষ্ট হব।

○ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যিকির দু'প্রকার। এক, মনে মনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা, যাতে আল্লাহ ব্যতীত কেউ না জানে। এটা খুবই উৎকৃষ্ট যিকির এবং এর সওয়াব বেশী। এর চেয়েও উত্তম যিকির হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে তখন স্মরণ করা, যখন তিনি বঞ্চিত করে দেন।

○ বর্ণিত আছে, সকল মানুষ পিপাসার্ত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে; কিন্তু যারা যিকিরকারী, তারা পিপাসার্ত হবে না।

○ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতীরা কোন কিছুর জন্যে পরিতাপ করবে না, কিন্তু সেই মুহূর্তটির জন্যে পরিতাপ করবে, যা তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাতে আল্লাহর যিকির করেনি।

মসলিসে যিকিরের ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা কোন মজলিসে যিকির করে, তাদেরকে ফেরেশতারা ঘিরে নেয়, রহমতের দ্বারা আবৃত করে এবং আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্ব জগতে তাদের কথা আলোচনা করেন।

○ যারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে এবং সেই যিকির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না, তাদেরকে একজন ফেরেশতা আকাশ থেকে ডেকে বলে ঃ ওঠ, তোমাদের মাগফেরাত হয়ে গেছে। তোমাদের পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

○ যারা কোন জায়গায় বসে আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে না এবং নবী (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে না, তারা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করবে।

○ হযরত দাউদ (আঃ) বলেন ঃ ইলাহী, যখন আপনি আমাকে

দেখেন, আমি যিকিরকারীদের মজলিস থেকে ওঠে গাফেলদের মজলিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন আমার পা ভেঙ্গে দিন। এটাও আপনার একটি কৃপা হবে।

০ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ একটি নেক মজলিসের দ্বারা ঈমানদারদের বিশ লাখ মন্দ মজলিসের কাফফারা হয়ে যায়।

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আকাশের অধিবাসীরা পৃথিবীবাসীদের সেসব গৃহের দিকে তাকাবে, যেগুলোতে আল্লাহর যিকির হতে থাকবে। সে ঘরগুলো তাদের চোখে তারকার মত জ্বলজ্বল করতে থাকবে।

০ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ যখন লোকেরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, তখন শয়তান তার দোসর দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং দুনিয়াকে বলে ঃ দেখছ, এরা কি করছে? দুনিয়া বলে ঃ করতে দাও। এরা যখন আলাদা হয়ে যাবে, আমি ঘাড়ে ধরে ওদেরকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার বাজারে গিয়ে লোকজনকে বললেন ঃ তোমরা এখানে রয়েছ, ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হচ্ছে! লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হল, কিন্তু সেখানে কোন অর্থ-সম্পদ দেখল না। তারা ফিরে গিয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলল ঃ আমরা তো কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন হতে দেখলাম না। হযরত আবু হোরায়রা বললেন ঃ তাহলে কি দেখেছ? তারা বললঃ কিছু লোককে দেখলাম তারা আল্লাহর যিকির করছে এবং কোরআন তেলাওয়াত করছে। তিনি বললেন ঃ এগুলোই তো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি।

০ হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সায়ীদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমলনামা লিপিবদ্ধকারীগণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও অনেক ফেরেশতা পৃথিবীতে যিকিরের মজলিস তালাশ করে ফিরে। তারা যখন কোন জনসমষ্টিকে আল্লাহর যিকির করতে দেখে,

তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ আপন কাজে চল। অতঃপর সকল ফেরেশতা সেখানে আসে এবং দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত যিকিরকারীদেরকে ঘিরে নেয়। এর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি কাজে দেখে এসেছ? ফেরেশতারা আরজ করেঃ আমরা তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তারা আপনার প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা আমাকে দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখে নেয়, তা হলে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে বেশীর ভাগ সময়ই আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করবে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি বস্তু থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতারা বলে ঃ তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ বলেন ঃ তারা জাহান্নাম দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নেয়, তবে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে আরও বেশী আশ্রয় চাইবে। আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলে ঃ তারা জান্নাতপ্রার্থী। আল্লাহ বলেন ঃ তারা জান্নাত দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলে ঃ না। আল্লাহ বলেন ঃ দেখে নিলে কি হবে? ফেরেশতারা বলে ঃ দেখে নিলে তারা আরও বেশী জান্নাত কামনা করবে। এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদেরকে ক্ষমা করলাম। ফেরেশতারা আরজ করেঃ ইলাহী, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যিকিরের নিয়তে সেখানে আসেনি; বরং নিজের কোন কাজে এসেছিল। আল্লাহ বলেন ঃ তারা এমন লোক যে, তাদের সাথে উপবেশনকারী কোন ব্যক্তিও তাদের বরকত থেকে বঞ্চিত হয় না।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যা কিছু আমি এবং আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বলেছেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম উক্তি হচ্ছে— لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

০ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

এই কালেমা পাঠ করবে, তা তার জন্যে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান হবে। তার জন্যে একশ' নেকী লেখা হবে। তার একশ' পাপ মোচন করা হবে। সে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। তার আমল থেকে উত্তম অন্য কারও আমল হবে না, সে ব্যক্তি ছাড়া, যে একশ'বারের বেশী এই কলেমা পাঠ করবে।

০ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই কলেমা পাঠ করবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

তার জন্যে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে যেতে পারবে।

০ যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তারা কবরে এবং কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময় আতঙ্কগ্রস্ত হবে না। আমি যেন দেখছি, তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সময় মাথা থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছে এবং মুখে বলছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

০ হে আব হোরায়রা, তুমি যে সৎকর্ম করবে, তা কেয়ামতের দিন ওজন করা হবে, কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিলে তা ওজন করার জন্যে কোন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি সত্য মনে এই কলেমা পাঠ করে, তার পাল্লায় যদি এই কলেমা রাখা হয় এবং সপ্ত আকাশ, সপ্ত পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লাই ঝুকে পড়বে।

০ যদি সত্য মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকিরকারী ভূপৃষ্ঠ পরিমাণও গোনাহ নিয়ে আসে, তবুও আল্লাহ তাআলা সব গোনাহ মাফ করবেন।

০ হে আবু হুরায়রা! মরনোম্মখ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য শিক্ষা দাও। এটা গোনাহসমূহকে বিনাশ করে। আবু হোরায়রা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা তো মৃতদের জন্যে। জীবিতদের জন্যে

কি? তিনি বললেন ঃ তাদের জন্যে আরও বেশী বিনাশ করে।

من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة -

যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

০ নিঃসন্দেহে তোমরা সকলেই জান্নাতে যাবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি মূলক ব্যবহার করবে, তার কথা ভিন্ন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর সাথে অস্বীকৃতিমূলক ব্যবহার কি? তিনি বললেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা। অতএব তোমরা বেশী পরিমাণে এই কলেমা উচ্চারণ কর। নতুবা একদিন তোমাদের মধ্যে ও এই কলেমার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। কেননা, এটা কলেমায়ে তওহীদ, কলেমায়ে আখলাক, কলেমায়ে তাকওয়া, কলেমায়ে-তাইয়েবা, দাওয়াতুল হক (সত্যের আহ্বান) এবং “ওরওয়ায়ে-ওছকা” তথা মজবুত রশি। জান্নাতের মূল্যও এটাই।

০ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

অর্থাৎ, পুণ্যের বদলা পুণ্য ছাড়া কিছুই নয়। এতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পুণ্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং পরকালের পুণ্য হচ্ছে জান্নাত। এমনিভাবে– لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

অর্থাৎ, যারা পুণ্য কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য এবং অতিরিক্ত আরও। এ আয়াতেও সে কথাই বলা হয়েছে।

০ হযরত বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশ বার বলবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।

০ আমর ইবনে শোআয়বের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি একদিনে দু'শ বার উপরোক্ত কলেমা পাঠ করবে, তার অগ্রে সে-ও যাবে না যে তার পূর্বে ছিল এবং তাকে সেও পাবে না, যে তার পরে হবে, কিন্তু যে তার চেয়ে উত্তম আমল করবে, সে অবশ্য তার অগ্রে থাকবে।

০ হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বাজারে বলবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

তার জন্যে দশ লক্ষ নেকী লেখা হবে এবং তার দশ লক্ষ গোনাহ মার্জনা করা হবে। জান্নাতে তার জন্যে একটি গৃহ নির্মিত হবে।

০ বর্ণিত আছে, বান্দা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখন এই কলেমা তার আমলনামার দিকে অগ্রসর হয় এবং যে গোনাহের উপর দিয়ে যায়, তাকে মিটিয়ে দেয়। অবশেষে নিজের মত কোন নেকী দেখে তার পার্শ্বে বসে পড়ে।

০ আবু আইউব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

বলে, তা তার জন্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে চারজন গোলাম মুক্ত করার সমান হবে।

০ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে জেগে উপরোক্ত কলেমার সাথে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

যোগ করে পাঠ করে, সে মাগফেরাত চাইলে মাগফেরাত হয়ে যাবে, দোয়া করলে তা কবুল হবে এবং ওযু করে নামায পড়লে নামায কবুল হবে।

সোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও অন্যান্য যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

০ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর 'সোবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবর ৩৩ বার এবং শ' পূর্ণ করার জন্যে উপরোক্ত কলেমা ১ বার বলে, তার গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

০ যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে, তার গোনাহ দূর হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়।

০ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমার তরফ থেকে সংসার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ফেরেশতাদের নামায এবং মানুষের তসবীহ পাঠ কর না কেন? এতে রুজি পাওয়া যায়। লোকটি বলল ঃ এটা কি? এরশাদ হল ঃ সোবহে সাদেক থেকে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'সোনহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীমি আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে নেবে। সংসার তোমার কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ধরা দেবে। এ দোয়ার প্রত্যেক কলেমা দ্বারা আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন। তারা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তসবীহ পাঠ করবে এবং তুমি তার সওয়াব পাবে।

০ বান্দা যখন আলহামদু লিল্লাহ বলে, তখন তা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলকে পূর্ণ করে দেয়। এর পর যখন দ্বিতীয় বার বলে, তখন সপ্তম আকাশ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু পূর্ণ করে দেয়। এর পর যখন তৃতীয় বার বলে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ চাও, তুমি পাবে।

০ রেফায়া জারনী বর্ণনা করেন– আমরা একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলে

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললেন, তখন এক ব্যক্তি পেছন থেকে বলল ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ নামাযান্তে তিনি বললেন ঃ কে বলেছিল? লোকটি আরজ করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বলেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি ত্রিশ জনের কিছু বেশী ফেরেশতাকে দেখলাম, এ কলেমাটি প্রথমে লেখার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

০ নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহ্র প্রতাপ, পবিত্রতা, একত্ব ও প্রশংসার যিকির করে, তাদের এসব কলেমা আরশের চারপাশে ঘুরাফেরা করে। মৌমাছির মত ভন ভন শব্দ করে এগুলো পরওয়ারদেগারের সামনে যিকিরকারীদের আলোচনা করে। আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বদা তোমাদের আলোচনা হোক, এটা কি তোমরা পছন্দ কর না?

০ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –বলা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম। এক রেওয়ায়েতে এর সাথে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্যটিও সংযুক্ত রয়েছে।

০ এ চারটি কলেমা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক পছন্দনীয় سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –এসব কলেমা বলে যে কাজ শুরু করা হবে, তাতে কোন ত্রুটি হবে না।

০ আবু মালেক আশআরীর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ বলা দাঁড়ি পাল্লা পূর্ণ করে দেয় এবং সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ বলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পূর্ণ করে দেয়। নামায নূর। খয়রাত দলীল। সবর আলো। কোরআন লাভ ও লোকসানের প্রমাণ। সকল মানুষ ভোরে ওঠে হয় নিজেদেরকে বিক্রি করে দেয়, না হয় নিজেদেরকে ক্রয় করে এবং মুক্ত করে।

০ হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ দুটি কলেমা জিহ্বায় হালকা, দাঁড়ি পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। একটি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ এবং অপরটি سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– কোন কালামটি আল্লাহ তাআলার অধিকতর প্রিয়? তিনি বললেন ঃ যে কালামটি তিনি ফেরেশতাদের জন্যে বেছে রেখেছেন অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

০ আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামের মধ্য থেকে এসব কলেমা বেছে নিয়েছেন– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বান্দা যখন সোবহানাল্লাহ্ বলে, তখন তার জন্যে বিশটি নেকী লেখা হয় এবং তার বিশটি গোনাহ দূরা করা হয়। যখন আল্লাহু আকবর বলে, তখনও তাই করা হয়। এভাবে শেষ কলেমা পর্যন্ত উল্লেখ করে বললেন, প্রত্যেকটি বলার পর তাই করা হয়।

০ হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে– যে ব্যক্তি সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে, তার জন্যে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

০ হযরত আবু যর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে– নিঃস্ব সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, ধনীরা সওয়াব নিয়ে গেছে। তারা আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের মত রোযা রাখে এবং অতিরিক্ত মাল খরচ করে, আমরা তা পারি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের জন্যে সদকা করার কিছু দেননি? তোমাদের জন্যে প্রত্যেক সোবহানাল্লাহ বলা সদকা, আলহামদু লিল্লাহ বলা সদকা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদকা, ভাল কাজের আদেশ করা সদকা, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সদকা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ,

আমরা স্ত্রীর সাথে কামভাব চরিতার্থ করব– এতেও সওয়াব পাওয়া যাবে? তিনি বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, যদি কাম-বাসনা হারাম স্থানে ব্যয় করতে, তবে গোনাহ হত কিনা? তাঁরা আরজ করলেন ঃ অবশ্যই গোনাহ হত। তিনি বললেন ঃ এমনিভাবে হালাল স্থানে তা ব্যয় করলে সওয়াব হবে।

০ হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– ধনীরা সওয়াবে আমাদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। আমরা যা বলি, তা তারাও বলে, কিন্তু তারা ব্যয় করে– আমরা করি না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন আমল বলে দিচ্ছি, যা তুমি করলে তোমার অগ্রগামীকে ধরে ফেলবে এবং তোমার পশ্চাদগামীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে। তবে যে তোমার কথামত কথা বলে, তার কথা ভিন্ন। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ে নেবে।

০ বুসরা বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ মহিলাগণ, তোমরা নিজেদের জন্যে সোবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুব্বুহুন কুদ্দুসুন বলা অপরিহার্য করে নাও। এতে শৈথিল্য করো না। অঙ্গুলির গিরায় গুনে নেবে। অঙ্গুলি কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে এবং কথা বলবে।

০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অঙ্গুলিতে সোবহানাল্লাহ গণনা করতে দেখেছি।

০ হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সাক্ষ্য দেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলছে যে, আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি সর্ববৃহৎ। বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে যে, আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি একক। আমার

কোন শরীক নেই। বান্দা যখন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। গোনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার ক্ষমতা অন্য কেউ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি এসব কলেমা মৃত্যুর সময় বলে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না।

০ মুসাইয়্যিব ইবনে সা'দ তাঁর পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কারও প্রত্যহ এক হাজার সৎকর্ম করার সাধ্য নেই। লোকেরা আরজ করল ঃ হাঁ, এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ যে একশ'বার সোবহানাল্লাহ বলে নেবে, তার জন্যে এক হাজার সৎকর্ম লেখা হবে এবং তার এক হাজার পাপ দূর করা হবে।

০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (অথবা আবু মূসা)! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্য থেকে একটি ভান্ডারের কথা বলব না? তিনি আরজ করলেন ঃ এরশাদ করুন। তিনি বললেন ঃ বল 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا ۔

অর্থাৎ, আমি আল্লাহকে পালনকর্তা জেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে ধর্ম জেনে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল ও নবী জেনে সন্তুষ্ট।

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এই কলেমা পড়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া রীতিমত পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

০ মুজাহিদ বলেন ঃ মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয় এবং বিসমিল্লাহ বলে, তখন ফেরেশতা বলে– তোকে হেদায়াত করা হয়েছে। যখন বলে تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ (আল্লাহর উপর ভরসা করলাম), তখন ফেরেশতা বলে– তোর জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

যখন বলে ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, তখন ফেরেশতা বলে– তোর হেফাযত করা হয়েছে। এর পর তার কাছ থেকে শয়তান আলাদা হয়ে যায়। কারণ, তার উপর শয়তানের শক্তি চলে না। সে আল্লাহর হেদায়াত ও হেফাযতে দাখিল হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন হয়, আল্লাহর যিকির জিহ্বায় হালকা এবং কম কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও সকল এবাদতের তুলনায় অধিক উপকারী কিরূপে হয়ে গেল? অথচ এবাদতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। এর জওয়াব হচ্ছে, এ বিষয়ের যথার্থ অনুসন্ধান তো এলমে মুকাশাফা ছাড়া অন্য কোথাও শোভনীয় নয়, কিন্তু এলমে মুয়ামালায় যতটুকু আলোচনা সম্ভব, তা হচ্ছে, যে যিকির কার্যকর ও উপকারী হয়, তা হচ্ছে অন্তরের উপস্থিতি সহকারে সার্বক্ষণিক যিকির। কেবল মুখে যিকির করা ও অন্তর গাফেল থাকা খুব কমই উপকারী। এ কথাটি হাদীস থেকেও জানা যায়। কোন এক মুহূর্তে অন্তর উপস্থিত হওয়া এবং অন্য মুহূর্তে দুনিয়াতে মশগুল হয়ে আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল হওয়া কম উপকারী। বরং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অন্তরের উপস্থিতি সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময়ে সকল এবাদতের অগ্রবর্তী; বরং এর মাধ্যমেই যিকির সকল এবাদতের উপর শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে এবং এটাই সকল কার্যগত এবাদতের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যিকিরের একটি শুরু ও একটি পরিণাম আছে। যিকিরের শুরু অনুরাগ ও মহব্বতের কারণ হয় এবং পরিণাম হচ্ছে, অনুরাগ ও মহব্বত যিকিরের কারণ হয়ে যায়। মহব্বতের কারণেই যিকির অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুরাগ ও মহব্বত যিকির করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই কাম্য। কেননা, শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থায় কখনও জোরপূর্বক আপন মন ও জিহ্বাকে কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রেখে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যাপৃত করে এবং খোদায়ী তওফীকে তা অব্যাহত রেখে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কেননা, অভ্যাসগতভাবে দেখা যায় যে, কারও সামনে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আলোচনা করা হলে এবং তার গুণাবলী বার বার তাকে শুনানো হলে সে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মহব্বত করতে থাকে। বরং কখনও অধিক আলোচনা দ্বারাই সে তার আশেক হয়ে যায়।

শুরুতে জোরপূর্বক যিকির দ্বারা আশেক হয়ে পরিণামে সে অধিক যিকির করতে এমন বাধ্য হয় যে, যিকির না করে থাকতেই পারে না। কেননা, যে যাকে মহব্বত করে, সে তার যিকির বেশী করে। এটাই নিয়ম। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার যিকির প্রথমে জোরপূর্বক হলেও তার ফলস্বরূপ পরিণামে আল্লাহর সাথে মহব্বত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকির না করে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। এটাই অর্থ জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত এই উক্তির, 'আমি বিশ বছর পর্যন্ত কোরআনের উপর কেবল মেহনতই করেছি। এর পর বিশ বছর কোরআন থেকে রত্ন আহরণ করেছি? এই রত্ন অনুরাগ ও মহব্বত ছাড়া কোন কিছু দ্বারা প্রকাশ পায় না। দীর্ঘ দিন জোরপূর্বক কষ্ট স্বীকার করলেই অনুরাগ ও মহব্বত অর্জিত হয় এবং তা মজ্জাগত হয়ে যায়। এ বিষয়টিকে অবান্তর মনে করবে না। কেননা, আমরা দেখি, মানুষ মাঝে মাঝে কোন বস্তু জোরপূর্বক খায় এবং বিস্বাদ হওয়ার কারণে তাকে পছন্দ করে না, কিন্তু জোরপূর্বক গলাধঃকরণ করে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ফলে শেষ পর্যন্ত বস্তুটি তার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায় এবং সে তা না খেয়ে থাকতে পারে না। মোট কথা, মানুষ অভ্যাসের দাস। প্রথমে যে কাজ সে জোরপূর্বক করে, শেষে তা তার মজ্জায় পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা অনুরাগ অর্জিত হয়ে গেলে অবশিষ্ট সবকিছু থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া মৃত্যুর সময় সে সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যাবে। পরিবারের লোক, ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কবরে তার সঙ্গে যাবে না। আল্লাহর যিকির ছাড়া সেখানে কিছুই থাকবে না। সুতরাং যিকিরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তা দ্বারা উপকৃত হবে এবং বাধা-বিপত্তি দূর হওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করবে। পার্থিব জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন যিকিরে বাধা সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পর কোন বাধা থাকবে না। তখন সে প্রিয়জনের সাথে একান্তে বাস করবে। তখন তার অবস্থা খুব উন্নত হবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরশাদ করেনঃ রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মনে এ কথা রেখে দিয়েছেন যে, তোমার প্রিয় বস্তু

তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। এখানে পার্থিব বস্তু বুঝানো হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংসশীল।

মৃত্যু মানে অস্তিত্ব লোপ পাওয়া; এর সাথে আল্লাহর যিকির কিরূপে থাকতে পারে? এ যুক্তির ভিত্তিতে মৃত্যুর পর যিকির করার কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। কেননা, মৃত্যুর কারণে মানুষ এমন বিলুপ্ত হয় না, যা যিকিরের পরিপন্থী। বরং সে কেবল দুনিয়া ও বাহ্যিক জগত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফেরেশতা জগত থেকে বিলুপ্ত হয় না। নিম্নোক্ত দু'টি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

القبر اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة -

কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

ارواح الشهداء فى حواصل طيور خضر

অর্থাৎ শহীদগণের আত্মা সবুজ পক্ষীকুলের পাকস্থলীতে থাকে। নিম্নোক্ত এরশাদেও এই ঈঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ হে অমুক, হে অমুক, তোমরা পরওয়ারদেগারে ওয়াদা সত্য পেয়েছ কিনা ? পরওয়ারদেগার আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি।

হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা শুনে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, তারা কিরূপে শুনবে এবং কিভাবে জওয়াব দেবে ? তারা তো মরে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তোমরা আমার কথা তাদের চেয়ে বেশী শুন না। পার্থক্য হচ্ছে, তারা জওয়াব দেয়ার শক্তি রাখে না। এ রেওয়ায়েতটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে। মুমিনদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন সে, তাদের আত্মা সবুজ পক্ষীকুলের পাকস্থলীতে আরশের নীচে ঝুলতে থাকে। হাদীসসমূহে বর্ণিত এই অবস্থা মৃত্যুর পর আল্লাহ্র যিকিরের পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে রিযিক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেন, তাতে তারা খুশী।

আল্লাহ্র যিকির শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে শাহাদতের মর্তবা শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কেননা, শাহাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে যাওয়া যে, অন্তর আল্লাহর মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । সুতরাং কোন বান্দা যদি আল্লাহর মধ্যে ডুবে থাকতে সক্ষম হয়, তবে যুদ্ধের সারি ছাড়া তার জন্যে এ অবস্থায় অন্য কোনরূপে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। কেননা, যুদ্ধের সারিতে নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এমনকি, সমগ্র দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। এগুলো জীবনের জন্যে আবশ্যক হয়ে থাকে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে যখন জীবনেরই কোন মূল্য থাকে না, তখন এসব বস্তুর কি মূল্য থাকবে ? এ থেকে জানা গেল, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মর্তবা অনেক বড়। কোরআন ও হাদীসে এর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর আনসারী শহীদ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর পুত্র জাবের (রাঃ)-কে বললেন ঃ জাবের, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। জাবের আরজ করলেন ঃ উত্তম, আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমার পিতাকে জীবিত করে নিজের সামনে এভাবে বসিয়েছেন যে, তার মধ্যে ও আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যে কোন আড়াল ছিল না। এর পর আল্লাহ্ বললেন ঃ হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে দান করব। তোমার পিতা বলল ঃ ইলাহী, আমার বাসনা, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, যাতে আমি আপনার পথে এবং আপনার রসূলের আনুগত্যে পুনরায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার আদেশ পূর্বে

জারি হয়ে গেছে– মানুষ মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে যাবে না। নিহত হওয়া এহেন পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুর কারণ। যদি নিহত না হয় এবং দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে, তবে দুনিয়ার কামনা - বাসনায় পুনরায় লিপ্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। এ কারণেই সাধকগণ খাতেমা অর্থাৎ শেষ অবস্থার ব্যাপারে খুব ভীত থাকেন। অন্তর যতই আল্লাহর যিকরে লেগে থাকুক, কিন্তু তা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং দুনিয়ার কামনা বাসনার দিকে কিছু না কিছু দৃষ্টি রাখে। সুতরাং শেষ অবস্থায় যদি অন্তর দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে আচ্ছন্ন থাকে এবং তদবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে অনুমান এটাই যে, মৃত্যুর পর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা করবে। কেননা, মানুষ যে অবস্থায় জীবন যাপন করে, সে অবস্থায়ই হাশর হয়। এমতাবস্থায় বিপদাশংকা থেকে অধিক আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করা। এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, শহীদের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন করা অথবা বীরত্বে খ্যাতি অর্জন করা ইত্যাদি না হওয়া চাই। এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ শহীদ হলে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সে জাহান্নামে যাবে। বরং শহীদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর বাণী সমুন্নত করা। নিম্নোক্ত আয়াতে এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিই দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে।

শহীদের অবস্থা কলেমায়ে তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উদ্দেশের অনুরূপ। কেননা, এই কলেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক উদ্দেশ্য মাবুদ এবং প্রত্যেক মাবুদ ইলাহ তথা উপাস্য। শহীদ ব্যক্তি তার অবস্থার ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন উদ্দেশ্য নেই। আর যে ব্যক্তি এই কলেমা তার মুখের ভাষায় বলে এবং তার অবস্থা এই কলেমার অনুরূপ না হয় তার

ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। সে বিপদমুক্ত নয়। এসব কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাকে সকল যিকিরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কোন কোন জায়গায় উৎসাহ দানের উদ্দেশে সর্বাবস্থায় এ কলেমা উচ্চারণ করাকেই যিকির বলেছেন এবং কোন কোন জায়গায় আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার শর্ত সহযোগে বলেছেন– من قال لا اله الا الله مخلصا (যে ইখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে)। ইখলাসের অর্থ হচ্ছে মৌখিক উক্তির অনুরূপ অবস্থা হওয়া। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন শেষ অবস্থায় আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যাদের অবস্থা, মুখের কথা এবং যাহের ও বাতেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুরূপ।

দোয়ার ফযীলত ও আদব

এ সম্পর্কিত আয়াত নিম্নরূপ ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ -

অর্থাৎ, হে নবী, আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন বলে দিন, আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি দোয়াকারীর দোয়ায় সাড়া দেই। অতএব তারা যেন আমার আদেশ পালন করে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে দোয়া কর। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

অর্থাৎ বলে দিন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর অথবা রহমানের

কাছে, তাঁর বহু উত্তম নাম রয়েছে, এখন যে নামেই ইচ্ছা দোয়া কর।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তা বলেন ঃ তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়ায় সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার এবাদতে অহংকার করে, তারা সত্বরই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এ সম্পর্কে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ

০ নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ الدعاء هو العبادة (দোয়াই হল এবাদত) অতঃপর তিনি اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

০ الدعاء مخ العبادة অর্থাৎ দোয়া এবাদতের সারবস্তু।

০ হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়ার চেয়ে বড় কোন কিছু নেই।

০ দোয়া দ্বারা তিনটি বিষয়ের কোন না কোন একটি অর্জিত হয় দোয়াকারীর গোনাহ মার্জনা করা হয় অথবা সে কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় অথবা কোন নেকী তার জন্যে সঞ্চিত রাখা হয়।

০ আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তিনি প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা চমৎকার এবাদত।

দোয়ার আদব দশটি ঃ

(১) দোয়ার জন্যে উত্তম দিনসমূহের দিকে তাকিয়ে থাকা; যেমন, বছরে আরাফার দিন, মাসসমূহের মধ্যে রমযান মাস, সপ্তাহের মধ্যে জুমুআর দিন এবং রাতের প্রহরসমূহের মধ্যে সেহরীর সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (তারা সেহরীর সময়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে।) রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা

প্রতি রাত্রে শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকার সময় দুনিয়ার আসমানে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দান করেন এবং বলেন ঃ এমন কে আছে, যে আমার কাছে দোয়া করবে আর আমি তা কবুল করব? বর্ণিত আছে, হযরত এয়াকুব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন– سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ (আমি সত্বরই তোমাদের জন্যে পরওয়ারদেগারের কাছে মাগফেরাতের দরখাস্ত করব)। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেহরীর সময় দোয়া করা। সেমতে তিনি রাতের শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করেন এবং দোয়া প্রার্থনা করেন। সন্তানরা তাঁর পেছনে আমীন আমীন বলেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ আমি তাদের অপরাধ মার্জনা করলাম এবং তাদেরকে পয়গম্বর করলাম।

(২) উত্তম অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহর পথে সৈন্যরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে এবং যখন ফরয নামাযের জন্যে তকবীর বলা হয়, তখন আকাশের দরজা খুলে যায়। এসব সময় দোয়া করাকে উত্তম সুযোগ মনে করবে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ নামাযসমূহ উৎকৃষ্ট মুহূর্তে নির্ধারিত হয়েছে। অতএব নামাযের পরে দোয়া করা অপরিহার্য করে নাও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আযান ও একামতের মাঝখানে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। বাস্তবে সময় উৎকৃষ্ট হলে অবস্থাও উৎকৃষ্ট হয়। উদাহরণতঃ সেহরীর সময় মনের পরিচ্ছন্নতা, আন্তরিকতা এবং উদ্বেগজনক বিষয়াদি থেকে মুক্ত হওয়ার সময়। আরাফা ও জুমআর দিন উদ্যমসমূহের একত্রিত হওয়া এবং আল্লাহর রহমত নামিয়ে আনার জন্যে অন্তরসমূহের ঐকমত্যের সময়। এছাড়া সেজদার অবস্থাও দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা সকল অবস্থা অপেক্ষা সেজদার অবস্থায় তার পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে রুকু ও সেজদায় কোরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব তোমরা রুকুতে আল্লাহর তাযীম কর এবং সেজদায় দোয়া করার খুব চেষ্টা কর। এ অবস্থা দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে উপযুক্ত।

(৩) কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা এবং হাত এতটুকু উঁচুতে তোলা যাতে বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে আগমন করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া করলেন। সালমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের পরওয়ারদেগার লজ্জাশীল দাতা। বান্দা যখন তাঁর দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে, তখন তিনি খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়ায় হাত এতটুকু উপরে তুলতেন যাতে তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত। তিনি দোয়ায় উভয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে তখন দোয়া করছিল এবং শাহাদতের উভয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করছিল। তিনি বললেন ঃ এক অঙ্গুলি দিয়েই ইশারা কর। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ শৃঙ্খলবদ্ধ হওয়ার পূর্বে হাতগুলো দোয়ার জন্যে উত্তোলন কর।

দোয়া শেষে উভয় হাত মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেয়া উচিত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উভয় হাত দোয়ায় প্রসারিত করতেন, তখন মুখমন্ডলে না বুলিয়ে সরাতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দোয়া করতেন, তখন উভয় হাতের তালু মিলিয়ে নিতেন এবং ভিতরের অংশ মুখের দিকে রাখতেন। দোয়ায় আকাশের দিকে দৃষ্টি না রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ লোকেরা যেন দোয়ায় তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকে। নতুবা তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।

(৪) নিম্নস্বরে দোয়া করা। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহযাত্রী হয়ে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি তকবীর বললেন। লোকেরাও

খুব উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ লোকসকল, যাকে তোমরা ডাকছ, তিনি বধির এবং অনুপস্থিত নন; বরং তিনি তোমাদের ও তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের মাঝখানে রয়েছেন। কোরআন বলে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا অর্থাৎ, তুমি নামাযে উচ্চ শব্দ করো না এবং চুপিসারেও পড়ো না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য, দোয়া সশব্দেও করো না এবং একেবারে নিঃশব্দেও করো না; বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আপন নবী যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاءً خَفِيًّا অর্থাৎ, যখন সে তার পরওয়ারদেগারকে আস্তে ডাক দিল।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বিনীত ও নীচু স্বরে ডাক।

(৫) দোয়ায় ছন্দ মিলানোর চেষ্টা না করা। দোয়ার অবস্থা কাকুতি মিনতি ও বিনয়ের অবস্থা হওয়া উচিত। এতে ছন্দের মিল সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা থাকা সমীচীন নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সত্বরই কিছু লোক এমন হবে, যারা দোয়ায় সীমালঙ্ঘন করবে।

কেউ কেউ– اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থাৎ, তোমাদের পালনকর্তাকে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে ডাক,তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

–এই আয়াতের তফসীরে বলেন, এখানে 'সীমালঙ্ঘনকারী' বলে দোয়ায় সযত্নে ছন্দের মিল সৃষ্টিকারীকে বুঝানো হয়েছে। সেমতে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া না করাই

উত্তম। কেননা, অন্য দোয়া করলে তাতে সীমালঙ্ঘনের আশংকা থাকে। ভাল দোয়া কোন্‌টি, তা সকলের জানা নেই। এ কারণেই হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে হাদীস অথবা তাঁরই উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতেও আলেমগণের প্রয়োজন হবে। যখন জান্নাতীদেরকে বলা হবে– তোমরা বাসনা কর, তখন কিভাবে বাসনা করতে হবে তা তাদের জানা থাকবে না। অবশেষে আলেমগণের কাছ থেকে শিখে বাসনা করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ দোয়ায় ছন্দের মিল সৃষ্টি থেকে দূরে থাক। তোমাদের জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং যে কথা ও কাজ মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে, তা প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যে কথা ও কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে, তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করি। পূর্ববর্তী জনৈক বুযুর্গ এক ওয়ায়েযের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। ওয়ায়েয তখন ছন্দ মিলিয়ে দোয়া করছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সামনে কাব্যিক বাহাদুরী প্রদর্শন করছ? সাক্ষী থাক– আমি হাবীব আজমীকে দোয়া করতে দেখেছি, যাঁর দোয়ার বরকত দেশময় খ্যাত। তিনি তার দোয়ায় এর বেশী বলতেন না–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَيِّدِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ -

— হে আল্লাহ, আমাদেরকে খাঁটি ও নির্মল কর। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করো না। হে আল্লাহ, আমাদের সৎকাজের তওফীক দান কর। মানুষ চতুর্দিক থেকে জড়ো হয়ে তারপেছনে দোয়া করত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ লাঞ্ছনা ও অক্ষমতার ভাষায় দোয়া কর– বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় নয়। কথিত আছে, আলেম ও

আবদালগণের মধ্যে কেউ দোয়ায় সাতটি বাক্যের বেশী বলতেন না। সূরা বাকারার শেষাংশ এর প্রমাণ। কোরআনের অন্য কোথাও বান্দার দোয়া এর চেয়ে বেশী উল্লিখিত হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, ছন্দের মিল বলে প্রয়াস সহকারে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। এটা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির পরিপন্থী। এখানে ছন্দের স্বাভিবিক মিল উদ্দেশ্য নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত দোয়ার মধ্যেও ছন্দের মিল বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এটা সযত্ন প্রয়াস ও বানোয়াট নয়। স্বাভাবিকভাবে আগত। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহকেই যথেষ্ট মনে করবে অথবা ছন্দের মিলের জন্যে প্রয়াস ছাড়াই কাকুতি-মিনতিসহকারে দোয়া করবে। মনে রাখবে, অক্ষমতাই আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয়।

(৬) আগ্রহ ও ভয়সহকারে দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা সৎকাজে অগ্রগামী হত এবং আমার কাছে আশা ও ভয়সহকারে দোয়া করত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করে নেন, তখন তার অনুনয়-বিনয় শুনার জন্যে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।

(৭) অকাট্যরূপে দোয়া করা এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, তখন এরূপে বলা উচিত নয় যে,ইলাহী! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি রহম কর; বরং দৃঢ়তার সাথে আবেদন করা উচিত যে, আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর। কেননা, আল্লাহর উপর কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারে না। তিনি আরও বলেন ঃ খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করা উচিত। কেননা, আল্লাহর জন্যে কোন কিছুই বড় নয়। অন্য এক হাদীসে আছে– আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া কর। মনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা গাফেল অন্তরের দোয়া কবুল করেন না। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ তুমি নিজের দোষত্রুটি অবগত হয়ে দোয়া থেকে বিরত

থেকো না। মনে করো না যে, তুমি অসৎ, তোমার দোয়া কবুল হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সর্বাধিক মন্দ অর্থাৎ, অভিশপ্ত শয়তানের দোয়াও কবুল করেছেন। সেমতে কোরআনে আছে–

قَالَ رَبِّ أَنْظِرْنِىْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ -

অর্থাৎ, শয়তান বলল ঃ পরওয়ারদেগার, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দাও। আল্লাহ বললেন ঃ যা তোকে সময় দেয়া হল।

(৮) উত্তম অবস্থায় দোয়ার শব্দাবলী তিন বার বলা। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলে তিনবার করতেন এবং কোন কিছু চাইলে তিন বার চাইতেন। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিলম্ব হয়ে গেছে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের দোয়া তখন কবুল হবে, যখন তোমরা তড়িঘড়ি করবে না এবং এরূপ বলবে না যে, আমি দোয়া করলাম অথচ কবুল হল না। দোয়া করার সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক কিছু চাইবে। কেননা, আল্লাহ মহান দাতা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বিশ বছর যাবত একটি বিষয় চেয়ে দোয়া করছি, এখনও কবুল হয়নি, কিন্তু কবুল হবে বলে আমার আশা আছে। বিষয়টি হচ্ছে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করার তওফীক কামনা করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চাওয়ার পর যদি জানতে পারে যে, দোয়া কবুল হয়েছে, তবে সে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার নেয়ামত দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে। দোয়া কবুলে কিছু বিলম্ব হলে এরূপ বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে।

(৯) আল্লাহর যিকির দ্বারা দোয়া শুরু করা এবং প্রথমেই সওয়াল না করা। সালামা ইবনে আকওয়া বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কখনও এই কলেমা না বলে দোয়া শুরু করতে শুনিনি–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعُلَى الْاَعْلَى الْوَهَّابِ -

অর্থাৎ আমার মহান সুউচ্চ দাতা পরওয়ারদেগার পবিত্র।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন সওয়াল করতে চায়, তার উচিত প্রথমে দরূদ পড়া এবং দরূদ দ্বারা দোয়া সমাপ্ত করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা উভয় দরূদ কবুল করেন। কাজেই দরূদদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিষয় কবুল না করে ছেড়ে দেবেন– এটা তাঁর শানের জন্যে শোভন নয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর কাছে সওয়াল কর, তখন আমার প্রতি দরূদ পাঠ দ্বারা শুরু কর। আল্লাহ তা'আলার শান এরূপ নয় যে, কেউ তাঁর কাছে দুটি বিষয় চাইলে একটি পূর্ণ করবেন এবং অপরটি করবেন না।

(১০) তওবা করা এবং হকদারদের হক তাদেরকে অর্পণ করে পূর্ণ উদ্যম সহকারে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করা। এ বিষয়টি মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে এটাই মূল কথা। কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি বনী ইসরাঈলের সাথে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন, কিন্তু বৃষ্টি হলো না। অতঃপর তিনি তিন দিন বাইরে থাকলেন, তবুও বৃষ্টি হল না। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ওহী পাঠালেন, আমি তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দোয়া কবুল করব না। তোমাদের মধ্যে চোগলখোর রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইলাহী, কোন্ ব্যক্তি চোগলখোর তা আমাকে বলে দিন। তাকে আমরা বহিষ্কার করব। আদেশ হল হে মূসা, আমি চোগলখুরী করতে নিষেধ করে নিজেই তা করব– এ কেমন কথা! মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বললেন ঃ তোমরা সকলেই চোগলখুরী থেকে তওবা কর। সকলেই তওবা করল। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

সায়ীদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক বাদশার আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনসাধারণ বৃষ্টির জন্যে দোয়া করল। বাদশাহ বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, না হয় আমি তাকে

কষ্ট দেব। জনগণ বলল, আপনি আল্লাহ তা'আলাকে কিরূপে কষ্ট দেবেন? তিনি তো আকাশে আছেন। বাদশাহ বলল, আমি তাঁর ওলী ও অনুগতদেরকে হত্যা করব। এটাই তাঁর কষ্টের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টি দান করলেন।

সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আমি শুনেছি, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একবার সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি লেগে থাকে। ফলে মানুষ মৃতদের ও শিশুদেরকে খেয়ে ফেলে। তারা পাহাড়ে গিয়ে গিয়ে ক্রন্দন করত ও কাকুতি মিনতি করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের পয়গম্বরের কাছে ওহী পাঠালেন; আমার দিকে চলে চলে যদি তোমাদের হাঁটু পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যায়, তোমাদের তোলা হাত আকাশের মেঘমালা স্পর্শ করে এবং দোয়া করতে করতে জিহ্বা ক্লান্ত হয়ে যায়, তবুও আমি কারও দোয়া কবুল করব না এবং ক্রন্দনকারীর প্রতি দয়া করব না, যে পর্যন্ত না হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। অতঃপর যখন সকলেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হল, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তারা বৃষ্টির জন্যে কয়েক বার বাইরে গেল, কিন্তু বৃষ্টি হল না এবং পয়গম্বরের কাছে ওহী এল ঃ তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নাপাক দেহে আমার দিকে আস এবং যে হাতে খুন করেছ, সেই হাত আমার দিকে প্রসারিত কর। তোমরা হারাম হাতের দ্বারা উদর পূর্ণ করে রেখেছ। ফলে তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ বেড়ে গেছে। এখন দূরবর্তী হওয়া ছাড়া তোমরা আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।

আবু সিদ্দীক নাজী বলেন ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) একবার বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন এবং পথিমধ্যে একটি পিপীলিকাকে উল্টে পড়ে থাকতে দেখলেন। পিপীলিকাটি পা আকাশের দিকে তুলে বলছিল, ইলাহী, আমরাও তোমার অন্যতম সৃষ্টি। তোমার রুজি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। অপরের গোনাহের বিনিময়ে আমাদেরকে ধ্বংস করো না। হযরত সোলায়মান (আঃ) লোকদেরকে বললেন ঃ ফিরে চল। অন্য

প্রাণীর দোয়ায় তোমরা বৃষ্টি পেয়ে গেছ। আওযায়ী বলেন ঃ একবার লোকজন বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হল। তাদের মধ্যে বেলাল ইবনে সা'দ দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ করার পর বললেন ঃ উপস্থিত লোকজন, তোমরা তোমাদের পাপ-তাপের কথা স্বীকার কর কিনা? সকলেই বলল, নিশ্চয় স্বীকার করি। অতঃপর বেলাল ইবনে সা'দ বললেন, ইলাহী, আমরা শুনেছি তুমি তোমার কোরআন মজীদে বলেছ- مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করেছি। অতএব তোমার মাগফেরাত আমাদের মত লোকদের জন্যেই। ইলাহী, আমাদের মাগফেরাত কর, আমাদের প্রতি রহম কর এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর বেলাল হাত উত্তোলন করলেন। লোকেরাও হাত তুলল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি বর্ষিত হল।

মালেক ইবনে দীনারকে লোকেরা বলল, আপনি আমাদের জন্যে পরওয়ারদেগারের কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে করছ বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি প্রস্তর বর্ষণে বিলম্ব হচ্ছে। অর্থাৎ, আমাদের পাপ-তাপ প্রস্তর বর্ষণের যোগ্য।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একবার বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে বের হলেন। ময়দানে পৌঁছে তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা গোনাহ করেছ, তোরা ফিরে যাও। এ কথা বলার পর এক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন ঃ তুমি কি কোন গোনাহ করনি? সে বললঃ আমি অন্য কোনা গোনাহ জানি না, তবে একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। আমার কাছ দিয়ে এক মহিলা চলে গেল। আমি তাকে চোখে দেখলাম। মহিলা চলে গেলে আমি চোখে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে উপড়ে ফেললাম এবং সেই মহিলার পেছনে নিক্ষেপ করলাম। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তুমি দোয়া কর। আমি আমীন বলে যাই। সেমতে লোকটি দোয়া করতেই আকাশ মেঘমালায় ছেয়ে গেল এবং প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

ইয়াহইয়া গাস্সানী বলেন ঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর আমলে অনাবৃষ্টি হলে লোকেরা আলেমদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তিকে মনোনীত করল এবং তাদের সাথে দোয়া করতে বের হল। একজন আলেম বললঃ ইলাহী, তুমি তওরাতে বলেছ–কেউ আমার উপর জুলুম করলে আমরা যেন তাকে মাফ করি। ইলাহী, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। দ্বিতীয় আলেম বললঃ ইলাহী, তুমি তওরাতে বলেছ–আমরা যেন আমাদের গোলামদেরকে মুক্ত করে দেই। ইলাহী, আমরাও তোমার গোলাম। অতএব তুমি আমাদেরকে মুক্ত কর। তৃতীয় আলেম বললঃ ইলাহী তুমি তওরাতে বলেছ– আমাদের দরজায় মিসকীন এসে দাঁড়ালে আমরা যেন তাকে বঞ্চিত না করি। ইলাহী, আমরাও মিসকীন এবং তোমার দরজায় দন্ডায়মান। আমাদের দোয়া নামঞ্জুর করো না। এরূপ দোয়ার পর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

আতা সলমী বলেন ঃ এক বছর অনাবৃষ্টি হলে আমরা বৃষ্টির দোয়ার জন্যে বাইরে গেলাম। পথে সা'দুন নামক পাগলকে কবরস্থানে দেখা গেল সে আমাকে দেখে বললঃ এটা কেয়ামতের দিন, না মানুষ কবর থেকে বের হচ্ছে? আমি বললাম ঃ এসবের কিছুই নয়। বরং বৃষ্টি হয় না; তাই মানুষ দোয়া করতে বের হয়েছে। সে বলল ঃ হে আতা, কোন্ অন্তরে দোয়া কর– যমীনের অন্তরে, না আকাশের অন্তরে? আমি বললাম ঃ আকাশের অন্তরে। সে বললঃ কখনও নয়। হে আতা, মেকি মুদ্রাওয়ালাদেরকে বলে দাও– তারা যেন সে মুদ্রা না চালায়। কেননা, পরখকারী খুবই হুশিয়ার। এর পর সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললঃ ইলাহী, শহরগুলোকে বান্দাদের গোনাহের কারণে ধ্বংস করো না, বরং তোমার গোপন নামসমূহের বরকতে আমাদেরকে প্রচুর মিঠা পানি দান কর, যাতে বান্দারা জীবিত হয় এবং শহরগুলো সিক্ত হয়। তুমিই সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। আতা বলেন ঃ সা'দুনের এই দোয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই আকাশ গর্জে উঠল, বিদ্যুৎ চমকে ওঠল এবং মুষলধারে বারিপাত শুরু হল।

দরূদের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং সালাম বল।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) একদিন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বাইরে এসে বললেন ঃ আমার কাছে জিব্রাঈল (আঃ) এসে বলল ঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশ বার রহমত প্রেরণ করি এবং আপনার উম্মতের কেউ এক বার সালাম প্রেরণ করলে আমি তার প্রতি দশ বার সালাম প্রেরণ করি? এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, যে পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। অতএব ইচ্ছা করলে কেউ কম দরূদ পড়ুক অথবা বেশী পড়ুক। আরও বলা হয়েছে– সে ব্যক্তি আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে, যে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। ঈমানদারের জন্যে এটাই যথেষ্ট কৃপণতা যে, তার সামনে আমার আলোচনা হলে সে আমার প্রতি বেশী দরূদ প্রেরণ করে না। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হয় এবং তার দশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আরও বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি আযান একামত শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, তার জন্যে আমার শাফায়াত অপরিহার্য হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু– তুমি তোমার রসূল ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর, তাকে ওছিলা, ফযীলত ও সুউচ্চ মর্যাদা দান কর এবং কেয়ামতের দিন শাফায়াতের ক্ষমতা দান কর।

আরও বলা হয়েছে – পৃথিবীতে কিছু ফেরেশতা বিচরণ করে। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়। যখন কেউ আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা আমার আত্মা আমার মধ্যে ফেরত পাঠাবেন, যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দিতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরুদ প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তোমার বান্দা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধর, পত্নীগণ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি রহমত প্রেরণ কর ; যেমন রহমত প্রেরণ করেছ ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি ও ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি। মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পত্নীগণ ও সন্তান-সন্ততিকে বরকত দাও ; যেমন বরকত দিয়েছ ইবরাহীমকে (আঃ) ও তাঁর বংশধরকে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত পবিত্র।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ওফাতের পর লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)-কে ক্রন্দন করতে করতে এ কথা বলতে শুনল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; একটি খোরমা বৃক্ষের শাখার উপর আপনি খোতবা পাঠ করতেন। এ শাখাটি আপনার বিরহে আহাজারি শুরু করে। অবশেষে আপনি তার উপর হাত রেখে দিলে সে চুপ হয়ে যায়। এখন আপনার বিরহে আপনার উম্মতের

আহাজারি আরও অধিক শোভনীয়। ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক; আল্লাহ তা'আলার কাছে আপনার মর্যাদা এত দূর উন্নীত হয়েছে যে, আপনার আনুগত্য আল্লাহ নিজের আনুগত্য সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۔

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আল্লাহর কাছে আপনার মর্তবা এতটুকু উন্নীত হয়েছে যে, আপনার ত্রুটি আপনাকে বলার আগেই আল্লাহ তা মার্জনা করে দিয়েছেন। সেমতে বলা হয়েছে–

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। আপনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন কেন? ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ-হোক; আপনার মর্যাদা এত উচ্চে যে, আপনাকে সকল নবীর শেষে প্রেরণ করেছেন এবং কোরআনে সকলের পূর্বে আপনাকে উল্লেখ করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى ۔

–যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম– আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার কাছ থেকে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, আপনার মর্তবা এতটুকু যে, দোযখীরা দোযখের বিভিন্ন স্তরে আযাবে পতিত হয়ে বাসনা করবে হায়, আমরা যদি রসূলের আনুগত্য করতাম! সেমতে কোরআনে তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَ

–হায় আফসোস, আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম! ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক; আল্লাহ

তা'আলা মূসা ইবনে এমরানকে একটি প্রস্তর খন্ড দান করেছিলেন, তা থেকে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হত। এটা আপনার অঙ্গুলির জন্যে অভূতপূর্ব ছিল না। আপনার অঙ্গুলি থেকে পানির ফোয়ারা বয়ে যেত। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান (আঃ)-কে বায়ু দান করেছিলেন, যা সকাল-সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এটা আপনার বোরাকের চেয়ে অধিক বিস্ময়কর ছিল না, যাতে সওয়ার হয়ে আপনি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে সে রাতের ফজরের নামায নিজ গৃহে পড়েছেন। আপনার প্রতি রহমত হোক ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক ইয়া রসূলাল্লাহ; আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মরিয়মকে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মোজেযা দান করেছিলেন। এটা এ ঘটনা থেকে অধিক আশ্চর্যজনক ছিল না যে, বিষমিশ্রিত ভাজা করা ছাগল আপনার সাথে কথা বলেছিল। সেটির বাহু আরজ করেছিল ঃ আমাকে খাবেন না। আমার মধ্যে বিষ আছে। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; হযরত নূহ (আঃ) স্বজাতির জন্যে এই দোয়া করেছিলেন–

رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۔

–হে আল্লাহ! পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটি গৃহও অক্ষত ছাড়বেন না। আপনি আমাদের জন্যেও এরূপ দোয়া করলে আমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। অথচ আপনার পৃষ্ঠদেশ পিষ্ট করা হয়েছে, আপনার মুখমন্ডল আহত হয়েছে এবং সামনের দাঁত ভেঙ্গেছে, কিন্তু আপনি কল্যাণকর কথাই বলে গেছেন। আপনি বলেছেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ –হে আল্লাহ, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা কর। তারা অবুঝ। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক; আপনি বয়স কম পেয়েছেন। এ সত্ত্বেও এত লোক আপনার অনুসারী হয়েছে যা হযরত নূহ (আঃ)-এর হয়নি। অথচ তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আপনার প্রতি অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করেছে

এবং তাঁর প্রতি অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইয়া রসূলাল্লাহ আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক ; যদি আপনি নিজের কাছে নিজের সমতুল্য লোক ছাড়া অন্য কাউকে না বসাতেন, তবে সঙ্গে বসার সৌভাগ্য আমরা কোথায় পেতাম! যদি আপনি নিজের সমকক্ষ লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন, তবে এ সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত থাকতাম। যদি আপনি নিজের মত ব্যক্তির সাথে খাদ্য গ্রহন করতেন, তবে আপনার সাথে আহার করার গৌরব আমরা অর্জন করতে পারতাম না, কিন্তু আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, সঙ্গে বসে আহার করেছেন, পশমী-বস্ত্র পরিধান করেছেন, গাধায় সওয়ার হয়েছেন, অপরকে পেছনে সওয়ার করিয়েছেন, নিজের খাদ্য মাটিতে রেখেছেন এবং অঙ্গুলি লেহন করেছেন। এসব কাজ আপনি বিনয়বশত করেছেন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন এবং সালাম প্রেরণ করুন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতাম, কিন্তু সালাম বলতাম না। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ তুমি আমার প্রতি দরূদ পূর্ণ কর না কেন? এর পর যখনই লেখেছি দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করেছি।

আবুল হাসান শাফেয়ী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ۔

(আল্লাহ তা'আলা মোহাম্মদের প্রতি রহমত প্রেরণ করুক যতবার স্মরণ করে তাঁকে স্মরণকারীগণ এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয় গাফেল লোকেরা।)-এর বিনিময়ে সে আপনার কাছ থেকে কি পেয়েছে? তিনি বললেন ঃ সে আমার পক্ষ থেকে এই পেয়েছে যে, কেয়ামতের ময়দানে তাকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করানো হবে না।

এস্তেগফারের ফযীলত ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ, যারা অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে, অতঃপর তাদের গোনাহের জন্যে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আলকামা ও আসওয়াদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন মজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে, কোন বান্দা গোনাহ করে এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মার্জনা করেন। তন্মধ্যে একটি উপরোল্লেখিত আয়াত ও অপরটি এই ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ـ

—যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

অর্থাৎ অতঃপর তোমার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী। আরেক আয়াতে আছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

অর্থাৎ ভোর রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ। রসূলে করীম (সাঃ) প্রায়ই এই দোয়া উচ্চারণ করতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থাৎ পবিত্র তুমি হে আল্লাহ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী দয়ালু।

তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণে এস্তেগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক দুঃখ দূর করেন এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় করে দেন। তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমি দিনে সত্তর বার আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাত চাই এবং তাঁর সামনে তওবা করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অগ্র-পশ্চাত সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও যিনি এস্তেগফার ও তওবা করতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমার অন্তরে ময়লা এসে যায় যে পর্যন্ত না আমি প্রত্যহ একশ' বার এস্তেগফার করি। অন্য এক হাদীসে আছে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

যে ব্যক্তি এই কলেমা বিছানায় শোয়ার সময় তিন বার বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান অথবা মরুভূমির বালু কণার সমান অথবা বৃক্ষসমূহের পাতার সমান অথবা দুনিয়ার দিনসমূহের সমান হয়। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পরিবারের লোকজনের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতাম। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম; আমার ভয় হয়, কোথাও আমার কঠোর ভাষা আমাকে দোযখে না দাখিল করে দেয়। তিনি বললেন ঃ তুমি এস্তেগফার পড় না কেন? আমি তো দিনে একশ'বার এস্তেগফার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এস্তেগফারে এই কলেমা পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ